গালি ও গল্প

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—দেড় টাকা
প্রথম সংস্করণ
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫২

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

লোকের বিশ্বাস প্র. না. বি-র আর সব গুণ আছে কেবল বিনয় গুণটির অভাব। সেই ত্রুটি পূরণের জন্য তিনি একখানি বইয়ের নাম দিয়াছিলেন 'গল্পের মতো'। কিন্তু প্র. না. বি-র অদৃষ্ট মন্দ। যে-পাঠক-সমাজ তাঁহার কোন কথাই বিশ্বাস করে না (করিলে—হয় তাঁহাকে মারা উচিত, নয় নিজেদের মরা উচিত) এবারে তাহারা ধরিয়া লইল ওগুলা ঠিক গল্প নয়, গল্পের মতো মাত্র। প্র. না. বি. বুঝিতে পারিলেন যে সবগুণে সবাইকে মানায় না। তাই এবারে আর তিনি বিনয়ের অভিনয়ের চেষ্টা মাত্র না করিয়া বইয়ের নাম করণ করিলেন 'গালি ও গল্প'। আশা করা যায়, এবারে আর কাহারো অর্থবোধে কষ্ট হইবে না।

অতি সাধারণ ঘটনা

মানুষের মাথা যে এমন করিয়া কাঠের উপরে ঢুঁ মারিতে পারে এই লাইনের 'বাসে' না উঠিলে তাহা কখনই জানিতে পারিতাম না। উঁচু নীচু রাস্তায় বাসখানা এক একবার হুঁচোট খায় আর আট দশটা মাথা ছাদের কাঠের তক্তায় গিয়া আঘাত করে। কাঠও ফাটে না, মাথাও ভাঙে না—দুই-ই সমান শক্ত! আমি মাথায় ছোট, আমার মাথা ততদূর পৌঁছায় না বটে, কিন্তু সম্মুখবর্তীর পিঠে গিয়া গুঁতা মারে, গুঁতাটাকে সে আগে চালান করিয়া দেয়, এমনি করিয়া গুঁতাটা অগ্রসর হইতে হইতে গতির তীব্রতা হারাইয়া ফেলিয়া প্রথম সারির লোকের একটা শিরঃকম্পনে গিয়া অবসিত হয়। বাসের গায়ে পুরাতন অক্ষরে লেখা আছে বটে ষোলজন যাত্রী বসিবে, কিন্তু আমরা প্রায় পঞ্চাশজন লোক বসিয়া, দাঁড়াইয়া, বাঁকিয়া, দুমড়িয়া, ঝুলিয়া এবং দুলিয়া চলিয়াছি; পঞ্চাশজন এবং পঞ্চাশজনের আনুষঙ্গিক পৌঁটলা পুটলী। ভিড়টা এমনই সূচীভেদ্য যে সহযাত্রীদের কাহারো পূর্ণ মূর্তি দেখিবার সুযোগ নাই। কাহারো চেহারার সিকি, কাহারো দু'আনা, কাহারো মাথা, কাহারো জুতা মাত্র দেখিতেছি। আবার, একজনের দেহটাকে অনুসরণ করিয়া আর একজনের পায়ে গিয়া দৃষ্টি ঠেকে, একজনের হাতটাকে অনুসরণ করিলে আর একজনের কাঁধে গিয়া পৌঁছায়—গন্তব্যস্থলে পৌঁছান অবধি যখন এইভাবে ঝুলিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই, কাজেই ওই এক ধাঁধার মীমাংসা লইয়া কাটাইতেছি। পা দু'খানা এত পুষ্ট

অথচ মুখখানা রোগা! পা এবং মুখ একই জীবের কি না মীমাংসা করিতে ব্যস্ত এমন সময়ে কাঠোমো শুদ্ধ একবার নড়িয়া গেল, আর একটু হইলে একখানা মিলিটারী গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়াছিল আর কি! ধাক্কা না দিলে কাহারো বাঁচিবার আশা ছিল কি?—পথের পাশেই গভীর নালা। বোধ করি কেহই বাঁচিত না! মুখ তুলিতেই বাসের দেয়ালের গায়ে লেখা চোখে পড়িল—"No chance"—কি সর্বনাশ! কোম্পানী তো স্পষ্ট করিয়া সতর্কবাণী লিখিয়া রাখিয়াছে—নো চান্স! যে রকম ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে 'নো চান্সই' বটে তো! কোন রকমে একবার নামিতে পারিলে হয়। পরে জানিয়াছি কথাটা 'No chance' নয়, 'No change'—অর্থাৎ ভাঙানি পাওয়া যাইবে না। কিন্তু G-টা C-এর মতো দেখায়—লেখাটা বোধ হয় দ্ব্যর্থক!

এমন সময়ে নর-ব্যূহের অবকাশে একখানা হাতের মণিবন্ধের অংশ চোখে পড়িল। আর কিছু দেখা যাইতেছে না। ধাঁধার মীমাংসায় আবার লাগিয়া গেলাম—এ মণিবন্ধ যার, তার মুখ কোথায়? মণিবন্ধটা কোমল, সুকুমার, বর্ণ উজ্জ্বল! কিশোর বালকের হওয়াই সম্ভব। এমন সময়ে একটা গুতার ফলে সম্মুখে ঝুঁকিতে বাধ্য হইলাম—তখনি চোখে পড়িল মণিবন্ধের প্রান্তে একখানি শাঁখা। তবে তো বালিকার হাত। আর একবার হুঁচোট—আরও একটু অগ্রসর হইতেই চোখে পড়িল শাঁখার নীচেই একখানি লোহা। এবারে আর সন্দেহ নাই যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ওই মণিবন্ধ। তার মুখখানা বোধ করি ওই পাঞ্জাবীদ্বয়ের দাড়ির মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত। এমন সময়ে গোটা দুই আচ্ছা রকম ধাক্কা দিয়া বাসখানা থামিয়া গেল। একটা স্টেশন। এই লাইনের ইহাই উপান্ত স্টেশন। অধিকাংশ লোক ভারতীয় বহু জাতির বিচিত্র প্রতিনিধির দল—দাড়ি, পাগড়ী, টুপি, টিকি, টাক ও পোঁটলা

পুঁটলি লইয়া প্রস্তর খণ্ডবাহী জলস্রোতের মতো সবেগে নামিয়া গেল। বাস প্রায় খালি—এতক্ষণে বসিবার জায়গা পাওয়া গেল।

বসিয়া পড়িলাম। হাত, পা, ঘাড়, মাথা সব যেন আর কাহারো। বাঁকিয়া চুরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে সব অবশ হইয়া গিয়াছিল। হাত পা টান করিয়া ঘাড়টাকে কয়েকবার ঘুরাইয়া চেতনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় নানারূপ কসরৎ করিতেছি। ঘাড়টাই সবচেয়ে অসাড় হইয়াছে—বারংবার দুই বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া লইতেছি। একবার ঘাড় ঘুরাইতেই পাশের দিকের বেঞ্চিতে একটি মেয়ের উপরে চোখ পড়িল। কচি বয়স, সিঁথায় সিঁদুর, মুখে কচি ডাবের শ্যামল সৌকুমার্য এবং অনবদ্য স্নিগ্ধ রমণীয় একটি নিটোলতা; শ্যামল বাঙলার শ্যামা বালিকা।

লাবণ্য মসৃণ দু'খানি বাহু ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া অবশেষে পাঁচটি নীরব আঙুলে পর্যবসিত হইয়াছে। কোমল মণিবন্ধে শুধু একখানি করিয়া শাঁখা ও লোহা। ওঃ, তবে ইহারি মণিবন্ধের অংশ জনতার অবকাশে চোখে পড়িয়াছিল! কিন্তু ঘাড়টা এখনো স্ববশে ফেরে নাই--এখনো মাঝে মাঝে ঘুরাইতেছি। একবার মেয়েটিকে চোখে পড়ে আর একবার পথের পাশের কৃষ্ণচূড়ার অফুরন্ত পুষ্পিত আবীরের ছটা। হঠাৎ মনে হইল কিন্তু এ কি! মেয়েটি বিবাহিত অথচ হাতে কোন অলঙ্কার নাই কেন? বাঙলা দেশের বিবাহিত মেয়ে যত গরীবই হোক না কেন, আর মেয়েটিকে তো চেহারায় ও পোষাকে মধ্যবিত্ত ঘরের বলিয়াই মনে হয়, দুএকখানা সোনার অলঙ্কার পরিয়াই থাকে। একটা রুলি, দু'খানা চুড়ি, যা সকলেরই জোটে, বিবাহের সময়ে এই সামান্য অলঙ্কার না পায় এমন মেয়ে বাঙলাদেশে বিরল, ইহার কি তাহাও জোটে নাই? ইহার দারিদ্র্য কি এমনি অসাধারণ! অথচ মেয়েটির মধ্যে আর কোন অসাধারণত্ব

চোখে পড়ে না। কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, অলঙ্কারগুলা কোন আসন্ন বিপদের পথ রোধ করিতে গিয়াছে? এই অল্প বয়সে এমন কি বিপদ ইহার ঘটিল যাহাতে শাঁখা ও লোহা ছাড়া আর সব খুলিয়া দিতে হইয়াছে? ওই রিক্ত মণিবন্ধের নিরঞ্জন কোমলতা কেবলি মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগিল। অলঙ্কারের মধ্যে মেয়েদের ইতিহাস নিহিত—তাহাদের সৌভাগ্যের দুর্ভাগ্যের এবং পতনের।

বাস শেষ স্টেশনে আসিয়া থামিল। এখানে একটি প্রসিদ্ধ যক্ষ্মা-নিবাস অবস্থিত। যাহারা আসে—ওই যক্ষ্মানিবাসের আত্মীয়স্বজনকে দেখিতেই আসে। অন্য কাজে বড় কেহ আসে না। মেয়েটি নামিল—হাতে ছোট একটি ফলের পুঁটুলি। আর পাঁচজনের সঙ্গে সে অদূরস্থিত যক্ষ্মানিবাসের দিকে দ্রুত পদে চলিয়া গেল। অমনি এক বিদ্যুতের ঝলকে তাহার মণিবন্ধচ্যুত অলঙ্কারের ইতিহাস বেদনার বহ্নি-ভাষায় আমার মনে উচ্চারিত হইয়া গেল। কোথায়, কেন সেই অলঙ্কারগুলি গিয়াছে বুঝিতে বিলম্ব হইল না। লুপ্ত অলঙ্কারের মধ্যে তাহার গুপ্ত ইতিহাসের একটা আভাস পাওয়া গেল। গাছপালার আড়ালে পথের বাঁকে মেয়েটি অন্তর্হিত হইয়া গেল, কিন্তু আসন্ন অস্ত আভায় করুণ তাহার সেই মুখ, শঙ্খমাত্রসহায় অনন্য-অলঙ্কার সেই শূন্য মণিবন্ধ, কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। অনেক দিন ধরিয়া এই দু'টি ছবি আমার চেতনার মধ্যে সূচী চালনা করিয়া বেদনার কন্থা বুনিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম, যক্ষ্মানিবাসে গিয়া একবার খোঁজ করিলেই তো সব জানা যায়—সব জানাতেই সব কৌতূহলের পরিসমাপ্তি! কিন্তু তাহা আর সম্ভব হইল কোথায়? ভাবিলাম, নিজের মনেই মেয়েটির ইতিহাস রচনা করিয়া কৌতূহল শান্ত করি না কেন? তাহার ইতিহাসের কাঠামোটা তো সর্বজনবিদিত—তাহার ভাগ্যে নূতন আর কি ঘটিবে?

তাহার ব্যক্তিগত বেদনার মেঘের মধ্যেই তো সহস্রের অশ্রুজল সঞ্চিত হইয়া আছে! তাহার অজ্ঞাতে তাহার কাহিনী রচনা স্থির করিয়া ফেলিলাম। দুঃখের চক্রাবর্তনে তাহার কাহিনী শিল্পসামগ্রী হইয়া উঠিল। শিল্পেই পূর্ণতা—পূর্ণতাই শান্তি।

অতি সাধারণ ঘটনা, অতি সাধারণ মানুষ। অমিত আর শমিতার মাথা ভিড়ের মধ্যে তলিয়ে যাবার মাপে বিধাতা তৈরী করেছিলেন বলেই হোক, আর ইচ্ছার অভাবেই হোক, কখনো তারা ভিড়ের ঊর্ধ্বে নিজেদের মাথা উদ্ধত করে তোলেনি। পাহাড়ের সানুতে দৃষ্টির অতীত যে-সব শিলাখণ্ড পড়ে থাকে, তারাও একদিন অগ্ন্যুৎপাতের ঠেলায় অন্তিম ভাস্বরতায় আকাশপথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—অমিত শমিতার ভাগ্যে এমন কি সেই বেদনার দ্যুতিরও সৌভাগ্য ছিল না, বিধাতা নিতান্তই কৃপণ হাতে তাদের গড়েছিলেন। তারা ছিল ইতিহাসের রাজপথের 'ক্যাম্প্ ফলোয়ার'—যেখানে কেবল রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্রকেই চোখে পড়ে, বাকি অগণ্য লোক যেখানে নগণ্য; তারা জন নয়, জনতা মাত্র।

অমিত-শমিতা নাম এক সঙ্গে করলাম বটে এক জায়গায় তাদের জীবনে গ্রন্থিও পড়েছিল সত্য, কিন্তু বরাবর তারা এমন এক ছিল না। গোড়া থেকে এক থাকলে মাঝখানে এক হবার আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হ'ত। বিধাতা তাদের নগণ্য করেছিলেন কিন্তু নিরানন্দ করেন নি।

অমিত-শমিতার বিবাহের কথারই আভাস দিলাম। আধুনিক মতে স্ত্রী এক, পুরুষ এক; বিবাহে একে একে গ্রন্থি বেঁধে মিলন হয় বটে কিন্তু

সে দুইয়ের মিলন ; সংসারের উচ্চাবচ পথে একটু জোর হুঁচোট খেলেই গ্রন্থি ছিড়ে মিলিত দুই আকার হয়ে যায়—এক আর এক। আধুনিক মতে স্ত্রী আধ, পুরুষ আধ ; বিবাহের হোমানলে দুইআধ গলিত হয়ে একে পরিণত হয়। সংসাবের আবর্তে তাতে টান পড়ে বটে, কিন্তু ভিন্ন হবার কথাই ওঠে না ;—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, আধে আধে পূর্ণতা ঘটেছে যে !

অমিত-শমিতার বিবাহ হ'ল। কিন্তু অমনিতে হয় নি। প্রজাপতি অবশ্য অনুকূল ছিলেন কিন্তু সেই প্রজাপতির গুটি থেকে ঠিক কতখানি স্বর্ণসূত্র পাওয়া যাবে তা পরিমাপ করার ভার যাঁর উপরে, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন প্রতিকূল। অমিতের পিতা অর্ধেন্দুবাবু একালের নূতন বোতলে সেকালের পুরানো মদ। ছিপি না খোলা পর্যন্ত হালেব চোলাই বলে মনে হয়, কিন্তু ছিপি খুললেই বেরিয়ে আসে মনুসংহিতাব গন্ধ। সেকালের মদ বললো, পুত্রের বিবাহের কর্তা পিতা ; একালের বোতল বললো, দেখই না, ছেলে যদি নিজের শক্তিতে সোনার খনি আবিষ্কার করেই ফেলে—অত গোল করা কিছু নয়। তখন মদে বোতলে আপোষ হয়ে গিয়ে গ্রামের তারিণীচরণকে চিঠি লিখে দিল—ব্যাপারটার একবার খোঁজ খবর করা দরকার। তারিণীচরণ অর্ধেন্দুবাবুর গ্রামের লোক—থাকে কলকাতায়, যেখানে এখন রয়েছে অমিত এম-এ পাঠের উপলক্ষ্যে। তারিণীচরণের চিঠি এলো—শমিতরা জাতের এক আধ ধাপে নীচে হলেও তা চোখ বুজে সহ্য করবার মতো—কারণ গুটিতে স্বর্ণসূত্রের দৈর্ঘ্য বললেই হয়। তারিণীচরণ আবগারী বিভাগের লোক—জানে যে সত্যে পৌঁছবার পথ অত্যুক্তি। অর্ধেন্দুবাবু চোখ বুজেই রইলেন, সব জেনেও কিছু জানলেন না। বরঞ্চ না জানার পথ খোলা রাখবার জন্যে পুত্রকে একখানি চিঠি লিখে 'ফর্মাল প্রটেষ্ট' জানালেন, অথচ তার ভাষা এমন

হল না, যাতে বিবাহ ভেঙে যাবার আশঙ্কা আছে। অতএব অর্ধেন্দুবাবুর অনুপস্থিতিতেই অগত্যা অমিতের সঙ্গে শমিতার বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

ওরা ছিল এক কলেজের পড়ুয়া। কলকাতায় তখন সবে দ্বৈতী শিক্ষার ধারা স্বর্গলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈতী ধারার মিলনে কলেজের কলরোল নদনদী সঙ্গমের কলধ্বনিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। কিছুদিন এমন চলবার পরে কর্তৃপক্ষের মনে কি হ'ল, যার ফলে দ্বৈতী শিক্ষা অদ্বৈতপাঠে পরিণত হ'ল। মেয়েদের সময় ধার্য হ'ল সকালে; ছেলেদের দুপুরে। তবু ঐ এগারটার কাছ ঘেঁসে রইলো একটা দেখা-শোনার দিগন্ত।

অমিত-শমিতা মাত্র এক বছর দ্বৈত সাধনার সুযোগ পেয়েছিল—তার পরে এলো এই অসি-পত্রের ব্যবধান। প্রেম দুর্মর, সহজে তার অঙ্কুর মরতে চায় না; বাস্তব থেকে উৎপাটিত মূল হয়ে গেলেও আশার মধ্যে বায়ুজীবীরূপে বেঁচে থাকে। অমিত-শমিতার আশা রইলো—কলেজের গণ্ডী পার হতে পারলে আবার শিক্ষা জগতের পরলোক, অর্থাৎ পোষ্ট গ্রাজুয়েটে গিয়ে দেখা হবে। সেখানে বিরহের আশঙ্কা নেই। হ'লও তাই। কিন্তু এখানে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। কলেজের সীমাতেই তাদের সম্বন্ধে প্রেম শব্দটা প্রয়োগ উচিত হয়নি—কারণ সে অনুভূতি ওখানে তাদের ঘটেনি। অমিতের কথাই বলি। সে প্রথমে দেখতো প্রেমের একান্তে এক গুচ্ছ মেয়ে—সকলকে একসঙ্গে চোখে পড়তো অর্থাৎ কাউকেই চোখে পডতো না। এ সেই যুধিষ্ঠিরের অস্ত্র পরীক্ষার ব্যাপার আর কি! যুধিষ্ঠির তো শুধু পাখীটাকে দেখেননি, গাছ এবং আকাশের সঙ্গে এক করে পাখীটাকে দেখেছিলেন বলেই তিনি দ্রোণাচার্যের "ফেল করা" ছাত্র। তারপরে অমিত এক বিচিত্র

অভিজ্ঞতা অনুভব করলো। মাঝে মনে হ'ত সব মেয়েই এসেছে—তবু যেন ও-দিকটা শূন্য—সবই আছে, তবু কি যেন নেই। কেউ যদি তখন তাকে রহসে বলে দিত যে, অমিত, একেই বলে প্রেমের পূর্বাভাষ, তবে সে কথাটা নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিত। যখন এইরকম চলছে, অর্থাৎ ক্লাসের স্বাদ—বিস্বাদ, এমন সময়ে হঠাৎ সে করিডরে শমিতাকে দেখতে পেলো। চমকে উঠলো, সে যেন এক আবিষ্কার!—আমেরিকার ডাঙা চোখে পড়বার আগে তার ভাঙা ডালপালা সমুদ্রে দেখে কলম্বাস যেমন চমকে উঠেছিলেন। অমিতের মনে হ'ল, তাই তো। এই মেয়েটিই তো ক্লাসের লাবণ্য, যার অভাবে সমস্ত এমন বিস্বাদ বোধ হচ্ছে। পরীক্ষা করতেও বিলম্ব হ'ল না। তারপর দিন ক্লাসে শমিতা এলো, অমিতের মনে হ'ল—ক্লাস যে শুধু স্বস্থ হয়েছে তা নয়, এতক্ষণে পূর্ণ হ'ল। এতদিনে সে জনতা ভেদ ক'রে বিশেষ একটি জনকে দেখতে পেলো। এবারে সে অস্ত্র পরীক্ষায় যুধিষ্ঠিরের স্থান থেকে অর্জুনের স্থানে ডবল প্রমোশনে উন্নীত হ'ল।

তারপরে এলো তারা পোস্ট-গ্রাজুয়েটের ক্লাসে। সেখানে প্রতিদিন প্রেমের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা কচি গাছের নূতন কিশলয়ের মতো খেলতে লাগলো তাদের হৃদয়ে। কিন্তু অমিত-শমিতার প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে আমি বসিনি তো। আর বসলেই বা কি হ'ত? এমন কোনো অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে ঘটেনি যাকে নূতন বলা যায়; বিধাতা যে তাদের প্রতি অকৃপণ নন, সে তো গোড়াতেই বলে রেখেছি। জগতের আদি যুগে কোন কোন প্রবল জ্যোতিষ্ক আর একটা গ্রহের কাছ ঘেষে চলে যাবার সময়ে তার হৃদয়ে আগুনের জোয়ার জাগিয়ে দিয়ে যেতো, কিন্তু নিজে ধরা দিত না। অনেকেরই প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা ঐ জাতীয়। জ্যোতিষ্কের টানে হৃদয়ে জোয়ার জাগে—কিন্তু না দেয় ধরা, না পারে

ধরতে। কিন্তু ওরা প্রথমবারেই পরস্পর পরস্পরের কাছে ধরা দিল। অমিত-শমিতা বিবাহে প্রতিশ্রুত হল।

শমিতার সংসারে ছিলেন বিধবা মা। হিন্দু সংসারে স্ত্রীর মূল্য শূন্য, কিন্তু স্বামীর পাশে অধিষ্ঠিত হবার ফলে তার মূল্য যায় বেড়ে; সেই স্বামীর অবর্তমানে আবার সে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। শমিতার মা-র মূল্য এখন শূন্য। তাঁর হাতে কিছু টাকা ছিল, কিন্তু টাকাকে মূলধন ক'রে কি ভাবে সংসারে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে হয়, সে কৌশল তাঁর জ্ঞাত ছিল না। বিশেষ ও-টাকাকে তিনি মেয়ের সম্পত্তি ব'লেই জানতেন—সংসারে তাঁর আর কেউ তো নেই। তিনি বিবাহে খুসিই হলেন।

ওদের বিবাহ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, অর্ধেন্দুবাবু এলেন না—কেননা, বিবাহে উপস্থিতিতে বিবাহকে কতখানি স্বীকার করে নেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল—অথচ মনে মনে অনিচ্ছা ছিল না, কাজেই এ দুয়ের সামঞ্জস্য করবার উদ্দেশ্যে বিবাহে হল তাঁর কূটনৈতিক অনুপস্থিতি।

বিবাহের পরে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওদের সম্মিলিত জীবনে ঘটলো। অমিত সামান্য একটি চাকুরী পেলো আর শমিতার মা মারা গেলেন। যাই হোক, ইতিহাসের পাতার বাইরে যে অগণ্য লোকের জীবনস্রোত বইছে, তাদের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের জীবনও চলা শুরু করলো—কখনো বা দুঃখের কালো পাথর ডিঙিয়ে, কখনো বা উচ্ছল হাসির অজস্রতায়, আবার কখনো বা পঙ্কিল আবর্তনের মন্থন সহ্য করে।

ওদের একটি দুঃখ ছিল যে অর্ধেন্দুবাবু এলেন না। কিন্তু সে দুঃখ দীর্ঘকাল রইলো না। অর্ধেন্দুবাবু এলেন না বটে, কিন্তু তাঁর পত্র এলো। সে পত্রের ছত্রে ছত্রে পুরাতন মদের ছিটা। অর্ধেন্দুবাবু পুত্রের অবিমৃষ্য-

কারিতার জন্য তাকে তিরস্কার করেছেন। প্রাচীন কালের রাম ও পরশুরাম প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ভদ্রলোকগণ পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য কত কি অপ্রত্যাশিত কাজ করতে কুণ্ঠিত হননি—তার দীর্ঘ ফর্দ সেই পত্রে রয়েছে। অবশেষে আছে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের স্মারক। অর্ধেন্দুবাবু উদারভাবে লিখেছেন যে, যদিচ বধূমাতার জলগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তত্রাচ অমিত যদি তাঁকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠায় তবে তা তিনি গ্রহণ করতে সম্মত আছেন।

চিঠি পড়ে শমিতা বললো—মার তো কিছু টাকা আছে, তাই থেকে মাসে মাসে কিছু পাঠালেই হয়।

অমিত বললো—তা কি হয়? আমি দেখি কি করতে পারি।

সে কাজের উপরে খুচরো আর একটা কাজ জোগাড় করে নিলো এবং উদ্বৃত্ত অর্থ পিতাকে পাঠাতে লাগলো। এতে তার খাটুনি বেড়ে গেল। স্বাস্থ্য তার কোনদিনই ভালো ছিল না, এখন তাতে ঘাটতি দেখা দিতে শুরু হ'ল।

শমিতা বলে,—তুমি কাজ ছেড়ে দাও, ওই টাকা থেকে পাঠালেই চলবে।

অমিত বলে—ও-টাকাও তো আমার, প্রয়োজনকালে ও-টাকা কাজে লাগবে। এখন চলছে—চলুক।

অর্ধেন্দুবাবু টাকা পেয়ে খুসি হলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। যে এত দিচ্ছে সে আরও কত দিতে পারতো, এই চিন্তা তাঁকে অসন্তুষ্ট করে রাখলো। একটা না একটা উপলক্ষ্য করে তিনি টাকার দাবী চড়িয়ে যেতে লাগলেন, অমিতও সাধ্যাতীত পরিশ্রম ক'রে সে চাহিদা মিটিয়ে যেতে লাগলো। অর্ধেন্দুবাবু মনে মনে হাসেন, বৈবাহিক তাঁকে ঠকিয়েছিল বটে, এখন তিনি তার সঞ্চিত স্বর্ণসূত্রে টান দিচ্ছেন।

আর হাসতেন বিধাতা পুরুষ, অর্ধেন্দুবাবু স্বর্ণসূত্র উপলক্ষ করে নিজের পুত্রের স্বাস্থ্যে টান দিচ্ছেন, দেখতে পেয়ে।

২

অবশেষে ডাক্তারে একদিন স্পষ্ট করে বলতে বাধ্য হল যে, রোগটা টি-বি বলেই মনে হচ্ছে, তবে কিনা ভগবান আছেন। বাঘে যখন ধান খায় আর ডাক্তারে যখন ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তখন বুঝতে হবে সর্বনাশের আর অধিক বিলম্ব নেই।

সেদিনও প্রতিদিনের মতো অমিত অফিসে বেরুতে উদ্যত হচ্ছিল, শমিতা একেবারে দরজা রোধ করে দাঁড়ালো। বললো,—তুমি কি সর্বনাশের কিছুই বাকি রাখবে না!

অমিত বললে,—কিন্তু চাকরী না করলে চলবে কি করে?

শমিতা বললো,—তুমি চলে গেলে আমার চ'লে কি সুখ? শমিতা চাপা মেয়ে—এর বেশি বলা তার স্বভাবসিদ্ধ নয়। অমিত বুঝলো যে ওই কথা কয়টিতে আর দশজন মেয়ের অনেক কান্না, অনেক মাথা-কোটা ঘনীভূত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। অগত্যা সে বেরুবার আশা ছাড়লো।

তবু অমিত আর একবার বলবার চেষ্টা করলো—শমি, চলবে কেমন করে?

শমিতা শুধু বললো,—সে আমি দেখবো। মেয়েরা যখন 'দেখবো' বলে, তারা সত্যিই দেখে। পুরুষের মুখে ওটা একটা কথার মাত্রা মাত্র। অমিত শয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল; শমিতা সংসারের ভার তুলে নিল।

যক্ষ্মা ব্যাধিটা রাজকীয় ব্যাধি। প্রাচীনকালে রাজারা মানুষের দণ্ডাতীত ছিলেন, তাই তাঁদের দণ্ডিত করবার জন্যে অদৃষ্ট এই ব্যাধিটির সৃষ্টি করেছিল, সেই জন্যেই তো ওর পুরা নাম রাজযক্ষ্মা। কিন্তু যেহেতু আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে প্রত্যেক মানুষই একটি ছোট-খাটো রাজা, ওই ব্যাধিটা তাই ক্ষুদে রাজাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। কিন্তু স্বভাব বদলাতে পেরেছে কি? ওকে রাজকীয় আড়ম্বরে চিকিৎসা করতে হয়। সে সামর্থ্য আছে ক'জনের? আবার লোকেও ব্যাধির পূর্ব কৌলীন্য ভুলতে পারেনি; কাজেই যক্ষ্মাবাসগুলোতে খরচের উদারতা ঘটিয়ে সাধারণের আয়ত্তের বাইরে করে রেখেছে।

শমিতা সংসারের ভার নিয়ে দেখলে আয় বাড়াবার একমাত্র উপায় খরচ কমানো। শ্বশুরের মাসোহারার দিকেই তার প্রথম দৃষ্টি পড়লো। শমিতা অনেক ভেবে চিন্তে রাত জেগে অর্ধেন্দুবাবুকে সব অবস্থা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখে ফেললো। শ্বশুরকে এই তার প্রথম চিঠি। অর্ধেন্দুবাবুর উত্তর এলো—কিন্তু তা অমিতের নামে, তাতে পুত্রবধূর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে বিবাহ করবার দণ্ডস্বরূপ এই ব্যাধি যে তাকে আক্রমণ করেছে—একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। অদৃষ্টের উপরে তাঁর হাত নেই। পুনশ্চ জানিয়ে লিখেছেন এখন থেকে অমিত যেন তাঁর মাসোহারা চুনারের ঠিকানায় পাঠায়; ওখানকার স্বাস্থ্য ভালো ব'লে তিনি সেখানে কিছুকাল থাকবেন। শমিতা চিঠিখানা প'ড়ে ছিঁড়ে ফেললো, অমিতকে কিছু জানালো না। অমিত মাঝে মাঝে শুধাতো--বাবার টাকা নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে কিনা? শমিতা বলতো, হচ্ছে বই কি। কি করে যে হচ্ছে অমিত আব তা জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতো না। এই মিথ্যা কথাটা বলে শমিতা এমন আনন্দ পেলো, মহা সত্যকথা বলেও তেমনটি কখনো সে পায়নি।

ওদের সংসার কেমন ক'রে চলে এ প্রশ্ন অবান্তর, কারণ সংসার চলে না, চালাতে হয়। শমিতা কিছু কিছু সঞ্চয় ক'রেছিল, তার সঙ্গে মা'য়ের টাকা যুক্ত হ'য়ে একরকম ক'রে তাদের দিন চলে যায়—যাতে ভিতরে ভিতরে টান পড়ে অথচ বাইরে টোল খায় না।

অমিতের রোগ সারবার নয়, কিন্তু হয়তো কমতো যদি মনে তার দুশ্চিন্তা না থাকতো। সে যে অসহায় একটি মেয়ের ঘাড়ে নিজের ভার তুলে দিতে বাধ্য হ'য়েছে, এই গ্লানি তাকে ভিতরে ভিতরে চাবকাচ্ছিল।

তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে শমিতা কতবার চাকুরি করতে চেয়েছে—অমিত হেসে জবাব দিয়েছে, তুমিও যদি আয়ের পথ দেখো, তবে খরচ করবে কে? অমিত কিছুতেই তাকে চাকুরি করতে দিতে সম্মত হয়নি—ওতে তার পৌরুষ ব্যথা পেয়েছে। এখন তাই শমিতা চাকুরি করবার প্রস্তাব আর পাড়েনি, জানতো ওতে তাকে মর্মান্তিক কষ্ট দেওয়া হবে। কিন্তু সেদিন হঠাৎ অমিতই তাকে চাকুরি নেবার জন্যে অনুরোধ করলো। বললো—শমি, একটা ভাল চাকরির বিজ্ঞাপন দেখছিলাম, একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না। এই কথা শুনে শমিতার চোখ ছল ছল ক'রে উঠলো, তার কাছে কি লুকানো থাকবে না—কত দুঃখ, কত সংস্কার দমন ক'রে তবে ওই প্রস্তাব অমিত করতে পেরেছে? অমিত তখন কি দেখছিল? দেখছিল সকাল বেলার স্থলপদ্মের পাপড়ির মতো শাড়িখানা প'রে শমিতা সবে ফিরেছে, গ্রীষ্মের দুপুর তখন আড়াইটে, রৌদ্রের তাপে গাল দুটিতে তপ্ত আভা, কপালে অশাসিত চূর্ণ কুন্তল নানা বিচিত্র রেখায় লিপ্ত, কণ্ঠে স্বেদ বিন্দুর মুক্তার পাঁতি, চোখের কোণে ঈষৎ রক্তিমা। অমিত দেখলো, শমিতা সুন্দর। বাস্তবিক রৌদ্রে ঘুরে না এলে মেয়েদের সত্যিকার সৌন্দর্য খোলে না!

অমিত ভাবলো—এখন আর বৃথা পৌরুষের গর্ব ক'রে কি হবে? শমিতা চাকুরি নিলে আয়ের পথ প্রশস্ত হ'য়ে তার দুশ্চিন্তা কমবে।

শমিতা বললে, সে কি হয়! এখন চাকরি করতে গেলে তোমাকে দেখবে কে?

আসলে দেখবার সময়ের অভাবটা সত্য নয়। যে-কষ্ট সুস্থ সময়ে অমিতকে সে দিতে পারেনি, অসুস্থতার মধ্যে তা দেবার কল্পনাও শমিতার কাছে অসহ্য। কাজেই শমিতার আর চাকুরি করা হ'ল না। ওদের সংসার কি করে চলে? সংসার চলে না—সংসারকে চালাতে হয়।

৩

এই রকমে সুখে দুঃখে যখন ওদের জীবনযাত্রা চলছিল তখন অমিতের দেহের যক্ষ্মার বীজাণুগুলো নিশ্চিন্ত ব'সে ছিল না। ওই অন্ধ রোগ-বীজাণুর শ্রেষ্ঠ আবাস মানুষের দেহ বটে, কিন্তু মানুষের-সঙ্গে তাদের হৃদ্যতার কোন সম্বন্ধ নেই; তারা দিনরাত্রি মানুষের স্নেহ দয়া-মায়ার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধনিরপেক্ষতায় নিজেদের নিজেদের ধ্বংসমূলক কাজ করে যায়; নিরন্তর তারা মানুষের ফুসফুসে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছে—জীবন থেকে মৃত্যুতে পৌছবার নিশ্চিততম, সরলতম, একান্ততম পথ। ওরা স্নেহহীন, দয়াহীন, মায়ামমত্বহীন, ওরা অন্ধ, অজ্ঞান, সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী; মানুষের বুকের মধ্যে আর এক বিচিত্র জগৎ; মানুষের জগৎ ও বীজাণুর জগৎ এমন সমান্তরাল যে কোন কালে তাদের মিলিত হ'বার সম্ভাবনা নেই। তারপরে হঠাৎ একদিন দুই সমান্তরাল রেখা এক জায়গায় গিয়ে থেমে যায়—একই সঙ্গে দুইয়ের চিরাবসান।

এমন সময়ে শমিতার এক আত্মীয় শহরের নিকটের এক যক্ষ্মাবাসের ডাক্তার হ'য়ে এলেন। শমিতা তাঁকে গিয়ে ধরলো। তিনি অমিতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে তাকে কিছু কম খরচে যক্ষ্মাবাসে ভর্ত্তি ক'রে নিলেন।

অমিত টাকার কথা তুললো না, জানে যে ওতে শমিতাকে কেবল কষ্ট দেওয়াই হবে। তা'ছাড়া ভাবলো—আর কতদিনই বা! এ-ক'টা দিন শমিতার ইচ্ছেয় বাধা দেবার উৎসাহ তার হ'ল না। ও ভাবলো—এ-ক'টা দিনের সেবার স্মৃতি শমির মনে অক্ষয় হ'য়ে থাক্। আমার যখন আর কিছু করবার সাধ্য নেই—ওর মনে দুঃখের খোঁচা দেবার অহঙ্কারই বা করি কেন?

অমিত যক্ষ্মাবাসে ভর্ত্তি হ'লে শমিতা রোজ বিকেলে দেখা করতে যায়। অমিত টাকার প্রশ্ন তোলে না দেখে শমিতার ভাল লাগে না। বুঝতে পারে যে তার মনে প্রশ্নটা অব্যক্ত কাঁটার মত বিঁধে আছে। তাই সে একদিন নিজেই কথাটা তুলে বসলো—জানো, আমি স্কুলে একটা চাকরি নিয়েছি। কিন্তু পাছে এই কথায় ও মনে করে যে তার জন্যেই শমিতার এই কাজ গ্রহণ করতে হ'য়েছে, তাই ব্যাখ্যা স্বরূপে বললে—এখন তো সারাদিন ব'সে থাকা, একা একা ভাল লাগে না, তাই কাজ নিয়ে কোন রকমে ভুলে থাকি।

অমিত কি একথা বিশ্বাস করলো? কি জানি, হয়তো সে বিশ্বাস করতেই চায়। কিন্তু টাকা যে কোত্থেকে আসছে তা অমিতের চোখ এড়াতে পারলো না। সে দেখছে শমিতার হাতের চুড়ির গোছা ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। সে দেখতো, সবই বুঝতো, তবু চুপ ক'রে থাকতো, কারণ চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর যা করবে, তাতেই শমিতার কষ্ট বাড়বে বই কমবে না। কেবল সে রাতের বেলায় জেগে থেকে

অনেকক্ষণ ধ'রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো,—সেরে উঠবার নয়, কারণ তা বিধাতারও অসাধ্য,—সে প্রার্থনা করতো মরবার; শমিতার চুড়ির গোছা নিঃশেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার জীবনান্ত ঘটে। যে বিধাতা জীবন দান করতে অশক্ত, তিনি কি এই ইচ্ছামৃত্যু দানেও সমর্থ নন?

নিজের হাতের চুড়ির গোছা যে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে, সেদিকে শমিতার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একদিন আচম্বিতে তার খেয়াল হ'ল। শমিতা এলে অমিত তার অগোচরে একবার ক'রে চুড়ির সংখ্যা গুণে দেখতো। শমিতা এতদিন তা লক্ষ্য করেনি। আজ হঠাৎ দু'জনের দৃষ্টি পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গেল। কিন্তু শমিতা যেন কিছুই বোঝেনি এমন ভাবে বললো,—একলা আসতে হয়, ফিরতেও একলা. তাতে আবার সন্ধ্যে হ'য়ে যায়, দিনকাল খারাপ, কতকগুলো চুড়ি খুলে রেখেছি। কেমন, ভালো করিনি?

অমিত শুধু বললো, ভালোই করেছো। সে রাত্রে অমিত একা বিনিদ্র জেগে প্রার্থনা করলো—হে সুখ-দুঃখের দাতা, যে একই সঙ্গে মানুষের বুকে আত্মবিস্মৃত প্রেম আর যক্ষ্মার বীজাণু বিতরণ ক'রে রেখেছ, তোমার কাছে কি ক'রে প্রার্থনা করতে হয় জানিনে। সে প্রার্থনার কতটুকু তুমি গ্রহণ করো, কতখানি বর্জন করো তাও জানিনে। তবু এ বিশ্বাস আছে, সুখের প্রার্থনার চেয়ে দুঃখের প্রার্থনা তুমি হয়তো দ্রুত হস্তে মঞ্জুর করে থাকো। আমার দেহাবসান শমির ওই চুড়ি ক'গাছার সঙ্গে ঘটিয়ে দাও প্রভু! তারপরে তার মনে হ'ল, এ প্রার্থনা কি তার সুখের নয়? এ অবস্থায় একমাত্র সুখ যা সম্ভব, তাইতো সে চেয়েছে! সর্ব-দুঃখের দাতা কি তা মঞ্জুর করবেন? দুঃখের ছদ্মবেশে এই সুখটুকু কি সে ফাঁকি দিয়ে আদায় ক'রে নিতে পারবে? আর যদি শমির চুড়ি

নিঃশেষ হ'বার পরেও তার জীবনান্ত না ঘটে, তখন কি হবে? সে শঙ্কিত-সম্ভাবনাকে আর সে কিছুতেই চিন্তা করতে পারলো না। ঘুমিয়ে পড়লো।

শমিতার সে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ঘুম হ'ল না। ঘুম না হওয়া তার নূতন নয়। কিন্তু আজকার নিদ্রাহীনতা একপ্রকার নূতন আনন্দের। সে ঘরে থেকে উল্লাসে পায়চারী ক'রে ফিরতে লাগলো—আমি মিথ্যা কথা বলেছি—আমি মিথ্যাবাদী। মিথ্যা কথা সে অমিতের জন্যে আগেও বলেছে—কিন্তু আগে এমন মিথ্যা কথায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয়নি। আজকার বিশেষ আনন্দ ওতেই। শমিতার মনে হচ্ছিল, কাছাকাছি যদি কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকতো তবে তাকে এখনি এত রাত্রে ঠেলে তুলে সব ঘটনা বর্ণনা করলে যেন আনন্দ দ্বিগুণিত হ'য়ে ফিরে পাবে। এই মিথ্যা'ভাষণের আনন্দ প্রণয়ের বিদ্যুৎ শিখার মতো তার আসন্ন বৈধব্যের শুভ্রশূন্যতার প্রান্ত বেষ্টন ক'রে চিরায়ুষ্মতীর রঙিন পাড় অঙ্কিত ক'রে দিল।

এর পরের ঘটনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। সুখদুঃখের বিধাতা, সুখের চেয়ে দুঃখ দিতে যিনি অধিকতর তৎপর, তিনি অন্তত একবারের জন্যেও অমিতের কথা রাখলেন। শমিতার শেষ চুড়িখানা নিঃশেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই অমিতের জীবনান্ত ঘটলো।

সেদিন শমিতা যখন এলো—তার হাতে একখানাও চুড়ি নেই। সেদিন সকালেই শেষ চুড়ি ক'খানা বেচে যক্ষ্মাবাসের আগামী মাসের পাওনা সে মিটিয়ে দিয়েছে।

শমিতা নিজেই প্রসঙ্গ তুললো। কালকে ফিরবার পথে হঠাৎ মাঠের মাঝখানে 'বাস্'এর কল বিগড়ে গেল। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, 'বাসে' আমরা দু'জন মাত্র যাত্রী—চারিদিক নির্জন, অনেক কিছুই ঘটতে

পারতো। যাক্, কোন বিপদ অবশ্য ঘটেনি। আমি ফিরে গিয়েই স্থির করলাম—আর নয়। তখনি চুড়ি ক'গাছা খুলে তুলে রেখে দিলাম। কেমন ভাল করিনি?

অমিত ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল। তারপরে একদিন সব অবসান হ'ল। তার হাতের শুভ্রশঙ্খের ক্ষীণ শশীকলা শুক্লা চতুর্থীর নবযৌবনের অকাল দিগন্তে কখন খসে পড়ে গেল। তার সিঁথিব সিদূরের শেষ রেখাটির চিহ্নমাত্রও আর কোন দিক্‌প্রান্তে রাখলো না। এতদিনে শমিতার নব নব মিথ্যাভাষণের শেষ আনন্দের অবকাশও অন্তর্হিত হ'ল।

অমিতের মৃত্যুর পরে যক্ষ্মাবাসেব কতৃপক্ষ তার একখানি চিঠি শমিতাকে পাঠিয়ে দিল।

অমিত লিখছে—

"শমি,

তোমার জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। শুধু রইল আমার ভালবাসা, আর তোমার অলঙ্কারগুলো। তুমি এম-এ পাশ করেছ, কোনরকমে তোমার চলে' যাবেই জেনে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চললাম।

অমি।"

মিথ্যা কথার প্রতিদান অমিত মিথ্যা কথায় দিয়ে গিয়েছে। শমিতা চিঠি প'ড়ে ভাবলো—তবে তো উনি আমার মিথ্যা ধরতে পারেন নি। বিধাতার আশীর্বাদে মিথ্যাই আমার সত্যের চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠলো। তবু কি তার সর্বত্যাগ অমিত জানতে পারলে শমিতা আরও বেশি সুখী হ'ত না! হয়তো হ'ত—নিশ্চয় ক'রে কে পরের মনের কথা বলতে পারে!

বিপত্নীক

অবশেষে ঘুমের আশা ছাড়িয়া দিতে হইল, ভাবিলাম ঘুম যখন হইবে না অন্তত ঘুমের ভান করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকি। একটু সুবিধাও ছিল, আগেকার মতো আলোর ব্যবস্থা নাই। কিন্তু চোখ বুজিতে গিয়া দেখিলাম অসুবিধা অনেক; প্রথমত এদিক ওদিকে মানুষের ঠেলায় দেহটা তিন চার জায়গায় মোড় ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে, তার উপরে আবার শরীরের তলায় গোটা চার পাঁচ ছোট বড় বোচকার গুঁতা। এরকম অবস্থা পঞ্চমুণ্ডীর শব সাধনার অনুকূল হইতে পারে—কিন্তু ঘুমের নয়; চোখ খুলিলে ছোট বড় মাঝারি, নূতন পুরাতন, তোরং বাক্স, স্যুটকেস প্যাটরা, পুঁটলি পোঁটলার দুঃস্বপ্ন; চোখ বন্ধ করিলে তামাক বিড়ি চুরুট সিগারেট, গাঁজাও আছে বোধ হয়—প্রভৃতির কুজ্ঝটিকা। এর উপরে আবার গাড়িটা অতর্কিতে থামিয়া গিয়া সর্বাঙ্গে মস্ত একটা করিয়া কনুইয়ের গুঁতা মারে। অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনের এক কামরায় বাঙ্কের উপরে আমি ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলিয়া আছি। গাড়ি বেলা আট-টায় কলিকাতা পৌঁছিবার কথা—কিন্তু গাড়িখানা যেখানে সেখানে যেমন খুসি থামিতে থামিতে চলিয়াছে, সময়মতো পৌঁছানর আশা সবাই ছাড়িয়া দিয়াছে—সবারই বেশ নির্বিকল্প অবস্থা। দেশলাই-এর স্ফুরিত আলোকে গাড়ির ওই প্রান্তের জনপিণ্ডটাকে চোখে পড়িতেছে—এর মাথা, ওর পা, তার কোমর কারো বা ঘাড়ে মিলিয়া একটা নিহত কীচকের মর্দিত দেহ। ওরা ঘুমাইতেছে। আর ঠিক আমার নীচেই একটা দল ঘুমের আশা ছাড়িয়া বিড়ি সিগারেট টানিতেছে। কাহারো চেহারা দেখিতে পাইতেছি না, তবে মাঝে মাঝে

নূতন বিড়ি ধরাইবার সময়ে দেশলাই-এর ক্ষিপ্রালোকে নাকের ডগা, গোঁফ থাকিলে গোঁফ, কাহারো চশমার ঝলমলানি চোখে পড়ে। তবে অন্ধকারে প্রত্যেকের গলার স্বরের বৈশিষ্ট্য এতক্ষণে চিনিয়া গিয়াছি। স্ফুরিত আলোকে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বরে ও চেহারাতেও মিলাইয়া লইতে পারিয়াছি—ওই যার বোঁচা নাক, গলার আওয়াজ তার বেজায় মোটা ; চশমা ও গোঁফওয়ালার স্বর ভাঙা ভাঙা ; মোটা লোকটার, ক্ষণিক দীপ্তিতেও তাহার আয়তন না বুঝিয়া উপায় নাই, গলার স্বর সরু, স্বরে আর চেহারায় সামঞ্জস্য করাই কঠিন। তিনজনেই বোধ হয় এক স্টেশনে উঠিয়াছে, একই জায়গার যাত্রী, হয়তো আত্মীয়স্বজনও হইতে পারে। এ-সবই তাহাদের আলাপ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

সরু আওয়াজ বলিল—ভাগ্যিস নিবারণকে সেকেণ্ড ক্লাসে দিয়েছিলাম। ওর এখন ঘুম দরকার।

মোটা আওয়াজ বলিল—আর ঘুম! জীবনের এক পর্ব শেষ হ'য়ে গেল। আর ঘুম—

সরু আওয়াজ বলিল—ঘুম না হোক্, বিশ্রাম তো চাই।

মোটা আওয়াজ বলিল—ক'বছর হ'ল হে, পাঁচ নয়?

কিছুক্ষণ পরে সরু বলিল—ছয় বছর। বোধ করি, সে মনে মনে মানসাঙ্ক কষিয়া লইয়াছে।

কিন্তু সরু মোটা কেহই নিজের কোট ছাড়িবার নয়। ছয় আর পাঁচে যখন রীতিমত কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিবার উপক্রম, তখন সেই ভাঙা-গলার ভাঙা কাঁসা খন্‌খন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল—নাও বাপু, একটু ঘুমোও তো! ছয়ও নয়, পাঁচও নয়—সাড়ে পাঁচ ; হ'ল তো!

একটু চুপ। বিড়ির আলোটা স্থান পরিবর্তন করিল। বুঝিলাম, ভাঙাগলা মোটাগলার মুখ হইতে বিড়িটা টানিয়া লইল। ও গোটা-দুই

খুব জোর টান মারিয়াছে—অনেকটা ধোঁয়া বিড়ির আলোয় দেখা গেল। তারপরে ভাঙা কাঁসা সুরু করিল—তোমরা যার হ'য়ে দুঃখ করছ, দেখগে সে এতক্ষণ সুখস্বপ্নে ভোর হ'য়ে ঘুমোচ্ছে !

এবারে সরু মোটা যুগপৎ ভাঙাগলার প্রতি সাঁড়াশি আক্রমণ করিল।

—কি যে বল্‌ছ, সবাই তোমার মতো নয় !

—নিবারণ কত ভালোবাসতো আমি তো জানি।

ভাঙা বলিল—ভালবাসা তো আমি অস্বীকার করছি না। স্ত্রীকে সবাই ভালবাসে, তাই ব'লে সে মারা গেলে আর বিয়ে করতে হবে না, এমন কোন্ শাস্ত্রে আছে শুনি ?

—বিয়ে করবে না কেন ? তবে তোমার কথা শুনে মনে হয় আজই বিয়ের কথা ভাবতে সুরু করেছে।

—শাস্ত্রের কথা নয় ভাই মনের কথা। পাঁচ বছরের ঘরকন্না, তার উপরে····

····তার উপরে দুটি ছেলেমেয়ে ? আরে সেই জন্যই তো আরো বেশি বিয়ে করা দরকার।

মোটাগলা এবারে হাসিল—

এ যে ব্যাধির চেয়ে ওষুধ অনেক বেশী উৎকট। ছোট ছেলেমেয়ে মা মারা গেলে অবশ্যই কষ্ট পাবে, কিন্তু কতদিন ? একটু বয়স হ'লেই আর কষ্ট পাবে না। কিন্তু দু-বছরের কষ্ট দূর করবার জন্যে এক সৎমা জুটিয়ে দিলে সারাজীবন যে কষ্ট পেতে হবে।

সরুগলা আর একদিক হইতে আক্রমণ করিল—কিন্তু নূতন যাকে বিয়ে করবে সে মেয়ে কেন পরের ছেলের দায়িত্ব নিতে রাজি হবে ? অবশ্য দায়ে পড়ে সবাই রাজি হয়—কিন্তু তাকে দিয়ে পরের ছেলে মানুষ করিয়ে নেবার অধিকার কারু নেই ! সমাজ তার উপরে অন্যায় করে—

সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করে আগের পক্ষের ছেলেমেয়েগুলো, সারাজীবনের দুঃখকষ্টে !

সরুগলা নিজের বাগ্মিতায় নিজেই বিস্মিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, খুব সম্ভব ওটা দম লইবার অবসর।

মানুষের সুখদুঃখের কথা নাকি উপর হইতে বিধাতা শোনেন। সত্য কিনা জানি না, তবে আমি তাহাদের এই আলাপ বাঙ্কের উপব হইতে শুনিলাম। না শুনিলেও ক্ষতি ছিল না। বিধাতার শুনিয়াও মানুষের লাভ হয় না। পরের গুহ্য বিষয় পারৎপক্ষে না শোনাই উচিত, কিন্তু সে বিষয়ে পরের সহযোগিতা প্রয়োজন। ইহারা যেমন নিরঙ্কুশ— না শুনিয়া উপায় কি ? মোটের উপরে বুঝিলাম, নিবারণ নামধেয় এক ব্যক্তিব সদ্য স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তাহার দুটি নাবালক ছেলেমেয়ে আছে। তাহারা কোথায় বুঝিতে পারিলাম না। তবে স্বয়ং নিবারণ পাশের এক সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বিরাজমান। সে নিদ্রিত কি জাগরিত এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। নিবারণকে একবার দেখিতে পাইলে হইত।

সরুগলা পুছিল—আচ্ছা, তুমি নিবারণের বিয়ের জন্য এত ক্ষেপে উঠলে কেন শুনি ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া মোটাগলা পুছিল—হাতে পাত্রী আছে নাকি হে ?

ভাঙাগলা সুরু করিল—নাঃ, ঘুমোতে, দেবে না দেখছি ! পাত্রী থাকাথাকি আবার কি ? কুলীনের ছেলে বুড়ো হ'লেও তার পাত্রীর অভাব হয় না—আর নিবারণ তো ছেলেমানুষ। কল্‌কাতায় পৌছে দেখো ঘটকের যাতায়াতে বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারবে না।

মোটাগলা বলিল—বাইরের ঘটকের চেয়ে ভিতরের ঘটককে করে বেশি ভয়।

—সে ভয় নেই।

—তবে তোমার এত উৎসাহ কেন?

ভাঙাগলা বলিল—আমি নিবারণের জন্যই বলছি। যদি বিয়ে করে তবে এখনি ক'রে ফেলুক। নতুবা—

—তবে শোনো—সে এক গল্প, মানে গল্প নয়, এক ট্রাজিক কাণ্ড। সে অনেক দিনের কথা। আজো ভুলিনি—কখনো ভুলবো না। সেই জন্যেই তো আমি বিপত্নীককে সর্বদা বিয়ে করতে উপদেশ দিই। বিপত্নীকে বিয়ে করলে অনেকে হাসাহাসি করে—আমি চুপ ক'রে থাকি—আমার মনে অনেক দিন আগের সেই ঘটনা মনে পড়ে যায়।

একটু দম লইয়া আবার সে সুরু করিল :

অনেক দিন আগে পশ্চিমের এক শহরে থাকতাম। তখন আমার বয়স অল্প। কত হবে?—বোধ করি দশ-বারোর বেশি নয়। একদিন হঠাৎ নেপালের তরাই অঞ্চল থেকে একদল লোক শহরে এসে উপস্থিত হ'ল। তারা অনেক দূর থেকে আসছে—সারাটা পথ হেঁটেই এসেছে; সঙ্গে কারো পয়সা-কড়ি ছিল না, তীর্থদর্শনে চলেছে দেওঘরে। বেচারা-দের অনেক কয়দিন খাওয়া হয়নি। এতগুলো লোককে কে আর খেতে দেবে? ও-দেশটাই যে গরীবের দেশ। কোনো কোনো দিন এক মুঠো ভুট্টা জুটেছে, কোনদিন তা-ও জোটে নি। যখন তারা শহরে এসে উপস্থিত হ'ল, যেন একদল কঙ্কাল! বাজারের কাছে এসে সব বসে পড়লো। তখন না আছে তাদের উঠ্‌বার শক্তি, না পারে ভালো ক'রে কথা বলতে। বাজারের লোক তাদের গিয়ে ঘিরে ফেল্‌ল। কি ব্যাপার? কোত্থেকে আস্‌ছ? কোথায় যাবে? সব ব্যাপার শুনে

তখনি একজন লোক গেল মুস্তফি-ডাক্তারের কাছে। তিনি শহরের সব বিষয়ের নেতা। মুস্তফি বললেন—ওদের ওষুধের চেয়ে পথ্যের দরকার বেশি। তখনি টাকা নিয়ে বাজারে এসে উপস্থিত হ'লেন। বাজার থেকে খাবার কিনে তাদের খেতে দিলেন। ক্ষুধার সে কি লোলুপ মূর্তি! কোনো দিন সে খাওয়ার ছবি ভুলবো না। তারপরে চালডাল যোগাড় ক'রে তাদের রান্নার যোগাড় ক'রে দিলেন। পয়সা দিয়ে চাল-ডাল কিনতে হ'ল না। দোকানদারেরা ক্ষুধিত তীর্থযাত্রীর নাম শুনেই বিনা পয়সায় সব দিল। বিশেষ মুস্তফিবাবু এসেছেন—তাঁর কাছে সবাই জীবন্মৃত্যুর ঋণে বাঁধা!

আমরা ছোট ছেলেরা আশেপাশে ঘুরচি, ফাই-ফরমাস খাটছি, জলটা পাতাটা এগিয়ে দিচ্ছি। তারপরে তারা সবাই যখন খেতে বসলো—শহরের লোক এসে ঘিরে দাঁড়ালো। কাঙালীভোজন দর্শনেও নাকি পুণ্য আছে। এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটলো—সেই কথাই বলতে যাচ্ছি—এটা শুধু তারই ভূমিকা। বাজারের মধ্যে ছোট্ট একটা গলি ছিল। হঠাৎ তার মধ্যে এক সোরগোল। ব্যাপার কি? খাওয়ার জায়গা থেকে সবাই ছুটলো সেইদিকে। ছোট্ট গলিটা ভিড়ে নিরেট হ'য়ে গেল। আর ভিড়ের মধ্যে আমাদের মাথা তলিয়ে গেল—কিছুই দেখতে পেলাম না। পরে শুনলাম—সাব্-জজ নাকি কলমি গোয়ালিনীর হাত চেপে ধরেছিলেন।

শহরে একজন পেন্সনপ্রাপ্ত সাব-জজ থাকতেন, বয়স সত্তরের ধারে-কাছে,—সম্ভ্রান্ত, বিশিষ্ট লোক। ঘরে নাতিনাতনি আছে—তবে স্ত্রী অনেককাল হ'ল গত হয়েছেন। কলমি গোয়ালিনি আধা-বয়সের একটি মেয়ে। সে এই গলির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল—সাব-জজবাবু তাকে অনুসরণ ক'রে গলিতে ঢুকে পড়েন—আর হঠাৎ এসে তার হাত ধরেন।

সে ভয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে—আর তখনি লোকজন জুটে গেল। এ সব তো পরে শুনেছি। তখন সেই জনতার যে অবস্থা! কেউ রাগ করলো, বললো—মারো ওঁকে! বেটা বেড়ালতপস্বী। কেউ কেউ বিদ্রূপ করতে লাগলো—সে কি অশ্রদ্ধার হাসি! এতদিন যাকে বড় বলে না মেনে উপায় ছিল না—তাকে হঠাৎ নীচের ধাপে দেখে মানুষের সে কি আত্মপ্রসাদের হাসি! সব্বাই ছি ছি করতে করতে চলে গেল। মুস্তফীবাবুর চেষ্টায় ব্যাপারটা ওখানেই মিটে গেল। সাব-জজবাবু লজ্জায় শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

মোটা ও সরু যুগপৎ বলিল—এ কেচ্ছা এখানে ফাঁদবার অর্থ কি?

—অর্থ সেদিনকার জনতাও বুঝতে পারেনি—আর তোমরাও বুঝতে পারলে না দেখছি।

মোটাগলা একটু রাগতভাবেই যেন বলিল—এর মধ্যে বুঝবার আবার কি আছে? একটা বুড়ো লম্পটের কাহিনী। পৃথিবীতে সত্যই ঘৃণার যদি কিছু থাকে তবে তা বৃদ্ধ লম্পট। ছি ছি! এই বলিয়া নিজের নৈতিক তাপে নিজেই হাত-পা সেঁকিতে লাগিল।

সরুগলা আবার সূক্ষ্ম সমালোচক। সে বলিল—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়াতে তোমার ঐ সাব-জজ বাবুকেই দেখেছি এবং দেখে হেসেছি।

—তার কারণ ওই প্রহসন তাকে নিয়ে হাসবার জন্যেই লিখিত। নাট্যকার শুধু কার্যটা দেখিয়েছেন তাই সেটা হয়েছে প্রহসন। শিল্পরীতি বদ্‌লে ওর কারণটা নিয়ে যদি নাটক লিখতেন, তবে হ'ত সেটা ট্রাজেডি। তখন হাসি না পেয়ে—

—কান্না পেতো?

—ট্রাজিডির উদ্দেশ্য কাঁদানো নয়—ভাবানো—আত্মদর্শনে সাহায্য করা বলতে পারো।

সরুগলা বলিল—আচ্ছা আমরা যেন কিছু বুঝিনি, তুমি কি বুঝেছ তাই শুনি না।

ভাঙাগলা বলিল—আমিও গোড়াতে তোমাদের মতই ভুল করেছিলাম, হেসেছিলাম, ধিক্কার টিট্‌কারিতে যোগ দিয়েছিলাম। বিশেষ তখন তো আমার বুঝবার বয়স নয়। কিন্তু বুঝি আর নাই বুঝি, ঘটনাটা মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। তারপরে কালক্রমে নিজের দুঃখের সঙ্গে ওই সাব-জজবাবুর দুঃখ জড়িয়ে, নিজের অভিজ্ঞতার পরিপূরক সাব-জজবাবুর ওই অভিজ্ঞতাকে ক'রে নিয়ে, এতদিনে ব্যাপারটার রহস্য যেন বুঝেছি।

দুই গলাই নীরব। সে বলিয়া চলিল—ওই যে ক্ষুধিত লোকগুলিকে খাওয়াবার জন্যে শহরের লোক আগ্রহ প্রকাশ করেছিল—সংসারে ক্ষুধার ওই এক মূর্তি। তার আর এক মূর্তি সাব-জজবাবুর কলমিব হাত ধরে টান দেওয়াতে। মানুষে শুধু কার্যটাই দেখে, কিন্তু যে দীর্ঘ কারণ পরম্পরার ঠেলায় কার্যটা অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, তা তাদের চোখে পড়ে না। ক্ষুধার এক মূর্তিকে তৃপ্ত করা ধর্মকার্য ব'লে মনে করি—অথচ ক্ষুধার আর মূর্তিকে....কি বলবো....এই অন্ধকারেও বলতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে! কিন্তু যা সত্য তা অন্ধকারেও সত্য! অতি পবিত্র চন্দন কাঠের আগুনেও তো হাত পোড়ে! একে তোমরা দুর্নীতি বলে সমর্থন না করতে পারো—অন্তত সত্য বলে স্বীকার করে নেবার সাহস যেন থাকে। সত্য যদি মুখ-নিবাসী হ'ত, তবে মুখ চাপা দিয়ে সত্যকে থামানো যেতো। কিন্তু যার বাস মনুষের স্বভাবের মধ্যে, তাকে থামাবে কি ক'রে? হিতোপদেশ, চাণক্যশ্লোক, বোধোদয় দিয়ে স্বভাবের সেতুবন্ধ সম্ভব নয়।

—তাই তুমি নিবারণকে—

....হ্যাঁ, তাই আমি তাকে অতি শীঘ্র বিয়ে করে ফেলতে বলি। স্ত্রীর মৃত্যুতে অবশ্যই তার দুঃখ হ'য়েছে, কিন্তু সেটা মনের ধর্ম। মন দুঃখিত

ব'লে কি দেহ তার ধর্ম ভুলবে? কেন ভুলবে? আর মানুষ মাত্রেই দেহধর্মের বশীভূত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও দেহধর্মের নিয়মে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল।

"....বেরিলি কি বাজার মে পানি গিরারে—আউর লাঠি গিরা রে।"

গাড়ির অপর প্রান্তের পিণ্ডীভূত জনতার কণ্ঠ হইতে গান উঠিল—'বেরিলি কি বাজার মে....।' বেরিলির বাজারের এই অভূতপূর্ব পতনের শব্দে এতক্ষণের চট্‌কা ভাঙিয়া পার্শ্ববর্তী বাস্তবে ফিরিয়া আসিলাম।

বেরিলির সঙ্গীতে মনে হইল রাত্রি ভোর হইয়া আসিয়াছে, নিদ্রিত জনপিণ্ড সহজাত শক্তির বলে তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াছে। ওঃ, গাড়ির মধ্যে এত ধোঁয়া জমিয়াছে যে কামরাখানা শিকলে বাঁধা না থাকিলে এতক্ষণে বেলুনের মতো আকাশপথে উড়িতে সুরু করিত! কাঁচের শার্সির দিকে তাকাইয়া মনে হইল বাহিরের গাছপালার একটা ঝাপসা রেখা যেন দৃশ্যমান; যেন রবার দিয়া ঘষিয়া মোছা পেন্সিলের অস্পষ্ট দাগ—আর তার উপরে গোটা কয়েক তারা। একবার জানালাটা খুলিয়া দিলে মন্দ হইত না। কিন্তু অনুরোধ করিলে কেহ উঠিবে না, নিজে উঠিয়া খুলিতে গেলে পার্শ্ববর্তী নিদ্রাভারাতুর দেহটাকে আরও একটু এলাইয়া দিয়া আমাকে স্থানচ্যুত করিবে। রাত্রিশেষের শেষ মুহূর্তে সকলেই সারা রাত্রির বিঘ্নিত নিদ্রার শোধ তুলিয়া লইতে ব্যস্ত। অতএব পূর্ববৎ পড়িয়া থাকিয়া কাঁচের শার্সির ঘষা রেখাটার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিন গলাই স্তব্ধ—বহুক্ষণের আলাপে ক্লান্ত কিম্বা হঠাৎ হয়তো ঘুমের দুরাশা তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে। ওদিকে বেরিলি বাজার শ্রেণীর সঙ্গীত সত্ত্বেও গাড়িটা অস্বাভাবিকভাবে নিস্তব্ধ। হয়তো

আমার কান তেমন সজাগ নয় বলিয়াই শুদ্ধ মনে হইতেছিল—মনের মধ্যে সাবজজবাবু ও নিবারণ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। নিবারণবাবু কি কালক্রমে সাবজজবাবুতে পরিণত হইবে না? না, কুলীনের ছেলে ভাসিয়া ওঠামাত্র ঘটক বোয়ালে গ্রাস করিয়া ফিলিবে? দুটাই সমান দুঃখকর। সাবজজবাবুর পরিণাম দুঃখের, কিন্তু তাই বলিয়া সদ্য বিগতপত্নীক শানাই বাজাইয়া পুনরায় বিবাহে চলিয়াছে—এ চিত্রও কম মর্মান্তিক নয়। সংসারের পথ সুখদুঃখের মধ্যগামী হইলে সংসার এমন দুর্বিসহ হইত না; সংসারে পথের একদিকে এক রকম দুঃখ, আর একদিকে আর এক রকম দুঃখ; একদিকে তার অতলস্পর্শী খাদ, অপর দিকে আকাশস্পর্শী চূড়া—যতো বুদ্ধিমানই হও না কেন, এক সঙ্গে দুটা আশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ কখনই পাইবে না। সংসারে সেই বুদ্ধিমান, সেই সৌভাগ্যবান্, তাহাকেই আমরা ঈর্ষা করি, যে দুটা মারের মধ্যে একটাকে বাঁচাইয়া যাইতে পারে। অধিকাংশ পথিকেই দুই হাতের মার খায়।

বাহিরে বনরেখার একটানা ঝাপসা ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র হইয়া বৃক্ষত্ব পাইয়াছে। আকাশের তারা দুটা নাই। গরমের দিন হইলে এতক্ষণে বেশ আলো হইত। গাড়িটা গোটা কয়েক বিষম ঝাঁকুনি দিয়া অনেকগুলা লাইন পার হইল। গতিও কমিয়া আসিয়াছে, বোধ হয় কোন স্টেশন আসন্ন।

এতক্ষণে সরুগলা, মোটাগলা, ভাঙাগলার চেহারা দিব্যি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের স্বরে, মতে, চেহারায় বেশ মিলাইয়া লইয়াছি। গাড়ির শূন্য আকাশ কালো মাথায় এবং ক্লান্ত চোখে ভরিয়া গিয়াছে, এতক্ষণ যাহারা নানা অপ্রত্যাশিত স্থানে, অসম্ভাবিত আকারে ঘুমাইতেছিল, এবারে তাহারা জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া রাত্রের অভদ্রতা,

পদাঘাত প্রভৃতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসন্ন স্টেশনের চায়ের অপেক্ষায় উৎসুক হইয়া আছে।

চায়ের আগ্রহ আমারও ছিল, তাই গুটি গুটি বাঙ্ক হইতে নামিয়া বেঞ্চির এক টেরে বসিলাম। কিন্তু মনে চায়ের আগ্রহের চেয়েও বেশি ছিল নিবারণকে দেখিবার ইচ্ছা। ভাঙাগলার ওকালতিতে মনঃস্থির হইয়া গিয়াছিল যে নিবারণের বিবাহ করা উচিত—কিন্তু তৎপূর্বে একবার নিবারণকে দেখিতে পাইলে হইত।

রানাঘাট। চা, খাবার, কাগজ, গরম দুধের বহুবিধ চিৎকারে যেন শব্দের মৌচাক ভাঙিয়া পড়িল। সব চেয়ে বেশি জটলা ধূমায়িত চায়ের স্টলের কাছে। প্রাতঃকালের কুয়াশা, উনুনের ধোঁয়া, পেয়ালার বাষ্প মিলিয়া বেশ একটা নীহারিকালোকের সৃষ্টি করিয়াছে।

তিন গলা একত্র হইয়া গলা ভিজাইবার জন্য জানলা দিয়া ঝুকিয়া পড়িয়া চা-করের উদ্দেশে ডাকাডাকি করিতেছে। এমন সময়ে সরুগলা হাঁকিয়া উঠিল—নিবারণ, নিবারণ রাতে ঘুম হ'য়েছিল তো? কেমন ছিলে?

চায়ের উমেদারদের মধ্যেই নিবারণ একজন। আমি নিবারণকে চিনিতাম না, কিন্তু চিনিবার প্রয়োজনও ছিল না—সহস্রের জনতার মধ্যেও তাকে বাছিয়া লইতে পারিতাম। মানুষের মুখে চোখে হাবেভাবে সর্বাঙ্গে যে এমন সূচীভেদ্য নৈরাশ্য থাকিতে পারে, তাহা না দেখিলে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। মেঘলা রাত্রের কুয়াশায় দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো তার ভাব। চুল রুক্ষ, দাড়ি গজাইয়াছে, কাপড়জামা এলোমেলো—চোখের অনাসক্ত উদাস দৃষ্টি। চা-পান করিবার আশায় সে দোকানে গিয়াছিল, কিন্তু চাহিতে ভুলিয়া গিয়াছে। তিন গলার তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকিতে একবার সে ফিরিয়া

তাকাইল বটে, কিন্তু উত্তর দিল না। অর্থ বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সে যেন এক জগতের লোক, এই সব আনাগোনা, ভালমন্দর সঙ্গে যেন তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। দুঃখের মূর্তি দেখিয়াছি, কিন্তু পরিপূর্ণ নৈরাশ্যের মূর্তি এই প্রথম দেখিলাম। দুঃখ অন্ধকার, নৈরাশ্য কুয়াশা; দুঃখ বিশ্বকে ঢাকিতে গিয়া অন্তত নিজকে প্রকাশ করে, কুয়াশা বিশ্বকেও ঢাকে নিজকেও প্রকাশ করিতে পারে না; দুঃখ দুর্বিষহ, নৈরাশ্য অসহ্য। নিবারণের পত্নীবিয়োগের নৈরাশ্য। আমি চা-পান করিতে ভুলিয়া গিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। ভাবিতেছিলাম কি? হয়তো রাত্রির তর্কের জের টানিয়া সত্যই কিছু ভাবিতেছিলাম; কিন্তু না, না, নিবারণের বিবাহের প্রশ্ন আর উঠিতেই পারে না। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তিনজনে নিবারণকে ডাকিতে লাগিল—সে একবার তাকাইল, কিন্তু গাড়ি ধরিবার জন্য কোনরূপ উদ্যম করিল না। সে একই স্থানে মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। শীতকালীন গাঢ় কুয়াশায় চারিদিক লুপ্ত, আজ সে কুয়াশা নিবারণের নৈরাশ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া যেন গাঢ়তর!

চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোশ

একদিন বিকাল-বেলা এক সরাইখানায় চারজন শ্রমিক আসিয়া পৌঁছিল। সরাইখানার মালিক তাহাদের যথা সম্ভব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। পথিকরা অনেক দূর হইতে আসিতেছে, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, গত রাত্রি তাহাদের সকলেরই বৃক্ষতলে কাটিয়াছে, আজ সরাইখানায় বিশ্রাম ও আহার করিতে পারিবে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহারা একটি কক্ষে বসিয়া আহার করিয়া লইল এবং তারপরে পরস্পরের পরিচয় লইতে লাগিল। তাহাদের কেহ কাহাকেও চিনিত না—এই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

প্রথম পথিক বলিল যে, সে একজন শিক্ষক। এখন বিদ্যালয়ের ছুটি, তাই সে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিল। হিমালয়ের পাদদেশে পশুপতিনাথের পীঠস্থান। কয়েকজন সঙ্গীর সাথে সে সেখানে গিয়াছিল। দেবদশন সারিয়া ফিরিবার পথে তাহার পথ হারাইয়া এক বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। রাত্রে তাহারা এক গাছের তলায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ভোর-বেলা যখন সে জাগিল, দেখিল যে তাঁহাদের সঙ্গীরা নাই, তৎপরিবর্তে তাহাদের কঙ্কাল কয়খানা পড়িয়া আছে। বোধ হয় কোন শ্বাপদে খাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সে একা বাঁচিল কিরূপে? তখন তাহার মনে পড়িল সে যে শিক্ষক, সে যে জাতিগঠনের রাজমিস্ত্রি—শ্বাপদ বোধ হয় সেই খাতিরেই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। যদি এ শ্বাপদটা তাহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র হইত, তবে কি আর তাহার রক্ষা ছিল? কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, হাজার হাজার ছাত্র শাসাইয়া এমন শক্তি সে অর্জ্জন করিয়াছে—সামান্য শ্বাপদে তাহার কি করিবে?

যাই হোক, আর যে-কারণেই হোক, সে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। সারা দিন চলিবার পরে সে এই সরাইখানায় আসিয়া পৌছিয়াছে। সংক্ষেপে ইহাই তাহার পরিচয়।

তখন দ্বিতীয় পথিক আরম্ভ করিল। সে বলিল যে, সে একজন সাহিত্যিক। গোরক্ষপুরে সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতি নিবাচিত হওয়ায় সেখানে সে গিয়াছিল। একটি বৃহৎ অট্টালিকায় যখন মহতী সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে এমন সময়ে এক কালান্তক ভূমিকম্প সুরু হইল। ফলে অট্টালিকার ছাদখানি পড়িয়া সকলেই মারা গেল—কেবল সে অক্ষতদেহে রক্ষা পাইয়াছে।

তাহার শ্রোতারা বিস্ময়ে বলিল—তাহা কিরূপে সম্ভব?

সাহিত্যিক বলিল—আপনারা জানেন না, আর জানিবেনই বা কিরূপে, আপনারা তো সাহিত্যিক নহেন, সাহিত্যিকদের মাথা বড় শক্ত। হেন ছাদ নাই—খসিয়া পডিয়া যাহা তাহাদের মাথা ফাটাইতে সমর্থ, হেন ভূমিকম্প নাই যাহাতে তাহারা টলে, হেন অগ্নিকাণ্ড নাই—যাহাতে তাহারা পোড়ে।

শিক্ষক বলিল—তবে অন্য সবাই মরিল কেন?

সাহিত্যিক বলিল—সে মহতী সাহিত্য সভায় আমিই ছিলাম একমাত্র সাহিত্যিক। ইহা শুনিয়া আপনারা বিস্মিত হইতেছেন—কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিয়া রাখুন সাহিত্য সভায় পারৎপক্ষে সাহিত্যিকরা কখনো যায় না—এক সভাপতি ব্যতীত। তাই তাহারা পিষিয়া মারা গেল—আর আমি যে শুধু বাঁচিয়া রহিলাম তা-ই নয়, আমার মাথায় লাগিয়া একখানা পাথরের টুক্‌রা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া গেল। এই সেই ধূলি।

এই বলিয়া সে পকেট হইতে এক কৌটা ধূলি বাহির করিয়া

দেখাইল। তারপরে বলিল—সাহিত্যিকদের বেলায় শিরোধূলি কথাটাই অধিকতর প্রযোজ্য। তারপরে গোরক্ষপুর হইতে বাহির হইয়া পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। ইহাই আমার পরিচয়।

তৃতীয় পথিক বলিল—মহাশয়, আমি একজন চিকিৎসক। হজরতপুরে মহামারী দেখা দিয়াছে শুনিয়া সেখানে আমি গিয়াছিলাম। সেখানে কোন চিকিৎসক ছিল না। আমি সেখানে গিয়া নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিবামাত্র হজরতপুরের সমস্ত অধিবাসী নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তাহারা যাইবার সময়ে বলিয়া গেল যে মহামারীর হাতে যদি বা বাঁচি—মহাবৈদ্যের হাত হইতে রক্ষা করিবে কে?

নগরের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক অতি কুৎসিত ও বীভৎস বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া বলিলাম—তুমি পালাও নাই কেন?

সে বলিল—আমার ভয়েই তো সকলে পালাইতেছে, আমি পালাইতে যাইব কেন? আমার নাম মহামারী। আমি তাহাকে বলিলাম যে, তোমার গর্ব বৃথা, সকলে আমার ভয়েই পালাইয়াছে, আমার নাম মহাবৈদ্য। ইহা শুনিবামাত্র সে প্রাণভয়ে পলায়ন সুরু করিল। কিছুকাল পরে দেখি হজরতপুরের নাগরিকগণ মহামারীর সঙ্গে সন্ধি করিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলিল—মহামারী আমাদের শত্রু নয়, মিত্র; যেহেতু তাহার কৃপাতেই আমরা অক্ষয়স্বর্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকি। তাহাদের সম্মিলিত শক্তির সম্মুখে আমি দাঁড়াইতে না পারিয়া পরম ভাগবত ইংরাজ সৈন্যের মতো দৃঢ়পরিকল্পনানুযায়ী পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বন্ধুগণ, ইহাই আমার ইতিহাস।

তখন চতুর্থ পথিকের পরিচয় দিবার পালা।

সে আরম্ভ করিল—মহাশয়, আমি গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম। সারা

দিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যায় যখন স্নান করিতে নামিব এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম কে যেন বলিতেছে—বৎস, তুমি যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ—এখন স্নান করো, করিবামাত্র তোমার মুক্তি হইয়া যাইবে, আর তোমাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না।

সে বলিল—মহাশয়, মুক্তি কাম্য ইহা জানিতাম, কিন্তু কখনো সদ্য মুক্তির সম্ভাবনা ঘটে নাই। আমি বিষম ভীত হইয়া পড়িলাম এবং গঙ্গাস্নান না করিয়াই পলায়ন করিলাম। রাত্রে পথ ভুলিয়া গেলাম, কোথা হইতে যে কোথায় গেলাম জানি না—তারপরে ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

তাহার কাহিনী শুনিয়া অপর তিন পথিক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার পরিচয় কি ?

ইহা শুনিয়া চতুর্থ পথিক বলিল—আমি একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা—যাহার বাংলা 'সিনেমা স্টার'।

তখন সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল—তাহার অভিজ্ঞতাই সব চেয়ে বিস্ময়কর—তবে সিনেমা স্টারের পক্ষে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

এই ভাবে পরস্পরের পরিচয় সাধনের পালা উদ্‌যাপিত হইলে চার জনে মিলিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিল; চারজনেই আশা করিল যে, রাতটা আমোদ-আহ্লাদে ও আরামে কাটাইতে পারিবে। এমন সময়ে সরাইখানার মালিক প্রবেশ করিল। সে অতিথিদিগকে বিশেষ আপ্যায়ন করিয়া সেখানে যতদিন খুসী কাটাইতে অনুরোধ করিল, বলিল—তাহাদের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে সে দৃষ্টি রাখিবে। তারপরে কি যেন মনে পড়াতে সে একটু হাসিয়া বলিল—এই সরাইখানার সমস্ত ঘরই অধিকৃত—কেবল একটিমাত্র ঘর খালি আছে।

পথিকরা বলিল—একটি ঘরেই আমাদের চলিবে।

সরাইখানার মালিক বলিল—ঘরটি নীচের তলাতে কাজেই একটু স্যাঁৎসেতে—

পথিকরা বলিল—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ঘরে তক্তপোশ আছে তো?

মালিক বলিল—তক্তপোশ অবশ্যই আছে—কিন্তু একখানা মাত্র, কাজেই আপনাদের তিনজনকে মেঝেতে শুইতে হইবে, সেই জন্যই স্যাঁৎসেতে মেঝের উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া আর কোন অসুবিধা নাই। আপনাদের মধ্যে কে তক্তপোশে শুইবেন তাহা আপনারা স্থির করিয়া ফেলুন, আমি আর কি বলিব? এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

তখন পথিক চারজন বিব্রত হইয়া পড়িল। কে বা তক্তপোশে শুইবে আর কারা বা মেঝেতে শুইবে! তাহারা সেই ঘরটায় গিয়া দেখিল সরাইখানার মালিকের কথাই সত্য। ঘরের মেঝে বিষম ভেজা, তার উপরে আবার এখানে সেখানে গর্ত, ইতস্ততঃ আরশুলা, ইদুর, ছুঁচো নির্ভয়ে পরিভ্রমণশীল, এক কোণে আবার একটা সাপের খোলসও পড়িয়া আছে। আর এক দিকে একজনের মাপের একখানা তক্তপোশ—সেটাও আবার অত্যন্ত জীর্ণ।

চারজনে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া ছুঁচোগুলা চিক্ চিক্ শব্দে পলায়ন করিল—যেন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কে তক্তপোশে শুইবে? কাহার শরীর খারাপ? চারজনেরই শরীরের অবস্থা সমান।

তখন শিক্ষক বলিয়া উঠিল—এক কাজ করা যাক। আমাদের মধ্যে

যাহার জীবন সমাজের পক্ষে সবচেয়ে দরকারী—সে-ই তক্তপোশে শয়ন করিবে, অপর তিনজনকে মেঝেতে শুইতে হইবে।

ইহা শুনিয়া তিনজনে যুগপৎ বলিয়া উঠিল—ইহা অত্যন্ত সমীচীন—আর ইহা শিক্ষকের যোগ্য কথা বটে। কিন্তু কাহার জীবন সমাজের পক্ষে সবচেয়ে দরকারী তাহা কেমন করিয়া বোঝা যাইবে? পরীক্ষার উপায় কি?

তখন সাহিত্যিক বলিল—আমি একটা উপায় নির্দেশ করিতে পারি। আসিবার সময়ে দেখিয়া আসিয়াছি কাছেই একটা গ্রাম আছে। সেখানে আমাদের কেহ চেনে না। আমরা চারজন চার পথে সেই গ্রামে প্রবেশ করিব। নিজেদের অত্যন্ত বিপন্ন বলিয়া পরিচয় দিব—ইহার ফলে গ্রামের লোকদের কাছে যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবে—বুঝিতে পারা যাইবে তাহারই জীবনের মূল্য সর্বাধিক। তক্তপোশে শয়ন করিবার অধিকার তাহারই।

সাহিত্যিকের উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া তিনজনে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

তখন চিকিৎসক বলিল—তবে আর বিলম্ব করিয়া কাজ কি? এখনো অনেকটা বেলা আছে—এখনি বাহির হইয়া পড়া যাক, রাত্রি প্রথম প্রহরের মধ্যেই ফিরিতে হইবে।

সিনেমা স্টার বলিল—আশা করি, আমরা সকলেই নিজেদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ফিরিয়া আসিয়া সত্য কথা বলিব।

ইহা শুনিয়া শিক্ষক বলিয়া উঠিল—হায় হায়, যদি মিথ্যা কথাই বলিতে পারিব তবে আজ কি আমার এমন দুর্দশা হইত!

তখন সকলে পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামের দিকে বিভিন্ন পথে প্রস্থান করিল।

২

রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই চার বন্ধু ফিরিয়া আসিল। সকলে একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়া সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া নিজের নিজের পরিভ্রমণ কাহিনী বলিতে স্বরু করিল।

প্রথমে শিক্ষক বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল—আমি উত্তর দিকের পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। কিছুদূর গিয়া একটি সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ি দেখিলাম—ভাবিলাম এখানেই আমার ভাগ্য পরীক্ষা করিব। বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র সেই দয়ালু গৃহস্থ আমাকে বসিবার জন্য একটি মোড়া আগাইয়া দিল। আমি তাহাকে নমস্কার করিয়া উপবেশন করিলাম। সদাশয় গৃহস্থ আমাকে আপ্যায়িত করিয়া আমার পরিচয় শুধাইল। আমি বলিলাম যে, আমি একজন বিদেশী শিক্ষক—পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।

ইহা শুনিবামাত্র গৃহস্থ চাকরকে ডাকিয়া বলিল—ওরে রামা, মোড়াটা ঘরে তুলিয়া রাখ্, বাহিরে থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি পরিত্যক্ত মোড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বলিলাম—আজ আপনার বাড়ীতে রাত্রি কাটাইবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ইহা শুনিয়া গৃহস্থ বলিল—তোমাকে যে আশ্রয় দিব তাহার স্থানাভাব। আমি বলিলাম যে, অন্য জায়গা যদি না থাকে, তবে অন্ততঃ আপনার গোয়াল ঘরে নিশ্চয় স্থান হইবে। ইহা শুনিয়া গৃহস্থ বলিল—গোয়াল ঘরেই বা স্থান কোথায়? দশ-বারোটা গোরু আছে। কোনটাকে বাহিরে রাখিতে সাহস হয় না—রাত্রে বড় বাঘের ভয়। আজকাল গোরুর যা দাম জানো তো?

আমি কহিলাম—গোরুর চেয়ে শিক্ষকের জীবনের মূল্য কম?

সে বলিল—কি যে বলো? একটা যেমন তেমন গোরুও আজকাল

পাঁচ শো টাকার কম মেলে না? আর দশ টাকা হইলেই একটা শিক্ষক মেলে। এখন তুমিই বিচার করিয়া দেখো।

আমি বলিলাম—কিন্তু আমরা যে জাতিগঠন করি।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল—তার মানে তোমরা গোরু চরাও। কিন্তু রাখালের চেয়ে গোরুর মূল্য অনেক বেশি।

আমি বলিলাম—আপনার ছেলে নিশ্চয় শিক্ষকের কাছে পড়ে।

সে বলিল—পণ্ডিত, এখন পড়ে না। এক সময়ে তাহার জন্য একজন শিক্ষক রাখিয়াছিলাম। সে এখন আমার গোরুর রাখালী করে—কারণ সে দেখিয়াছে যে, শিক্ষকের চেয়ে রাখালের বেতন ও সম্মান অনেক বেশি। তবে তুমি যদি রাখালী করিতে চাও, আমি রাখিতে পারি—আমার আর একজন রাখালের আবশ্যক! আর তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, গোরুই যদি চরাইবে তবে এমন গোরু চরাও যাহারা দুধ দেয়। দুধ দেয় না এমন মানুষ গোরু চরাইয়া কি লাভ? যাই হোক, তোমার ভালমন্দ তুমি বুঝিবে—তবে বাপু এখানে তোমাব জায়গা হইবে না। ইহা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে শিক্ষকের জীবনের কি মূল্য। সেখান হইতে সোজা সরাইখানায় ফিরিয়া আসিলাম। এই বলিয়া সে নীরব হইল।

তখন চিকিৎসক তাহার কাহিনী আরম্ভ করিল। সে বলিল—দক্ষিণদিকের পথ দিয়া আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটি অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। অনুমানে বুঝিলাম বাড়ীটি কোন ধনীর—কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ও আশেপাশে লোকজনের উদ্বিগ্ন চলাচল দেখিয়া কেমন যেন সন্দেহ উপস্থিত হইল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি বাহিরে আসিতেছিল তাহাকে শুধাইলাম—মশায়, ব্যাপার কি? এ বাড়ীতে আজ কিসের উদ্বেগ?

সে বলিল—আপনি নিশ্চয় বিদেশী, নতুবা নিশ্চয় জানিতেন। তবে শুনুন, এই বলিয়া সে আরম্ভ করিল—এই বাড়ী গ্রামের জমিদারের। তাহার একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায়—এখন শেষ মুহূর্ত্ত সমাগত—যাহাকে সাধারণ ভাষায় বলা হইয়া থাকে যমে মানুষে টানাটানি—তাহাই চলিতেছে। বোধকরি যমেরই জয় হইবে।

আমি বলিলাম—এ রকম ক্ষেত্রে যমেরই প্রায় জয় হইয়া থাকে—তার কারণ চিকিৎসক আসিয়া যোগ দিতেই যমের টান প্রবলতর হইয়া ওঠে; ইহার প্রমাণ দেখিতে পাইবেন যে চিকিৎসক আসিয়া না পৌঁছানো পর্য্যন্ত রোগী প্রায়ই মরে না। কিন্তু তারপরেই কঠিন।

সে লোকটি বিস্মিত হইয়া কহিল—এ তথ্য আপনি জানিলেন কি করিয়া?

আমি সগর্বে বলিলাম—আমি যে একজন চিকিৎসক।

তখন সে বলিল—আপনার ভাগ্য ভাল, এ গ্রামের চিকিৎসকেরা কেহই রোগীকে নিরাময় করিতে পারে নাই—আপনি গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখুন। সফল হইলে প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিবেন।

আমি ভাবিলাম, সত্যই আমার ভাগ্য ভালো। একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। সফল হইলে আর সরাইখানার ভাঙা তক্তপোশে রাত্রি না কাটাইয়া জমিদার বাড়ীতেই আদরে রাত্রি যাপন করিতে পারিব।

তখন আমি ভিতরে গিয়া নিজেকে চিকিৎসক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়া রুগী দেখিতে চাহিলাম। আমাকে চিকিৎসক জানিতে পারিয়া জমিদারের নায়েব সসম্ভ্রমে বসিতে দিল। সম্যক্ পরিচয় পাইয়া বলিল—হাঁ, রুগীর অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। তবে আপনি যদি তাহাকে আরোগ্য করিতে পারেন তবে দশ হাজার মুদ্রা ও সরিফপুর পরগণা

পাইবেন। আমি উৎফুল্ল লইয়া উঠিলাম। তখন নায়েবের আদেশে একজন ভৃত্য আমাকে ভিতর মহলে লইয়া চলিল। পথে অনেকগুলি ছোট বড় কক্ষ পার হইয়া যাইতে হয়—একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে পাশাপাশি তিন-চারটি লোক কাপড় মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে দেখিতে পাইলাম। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা এমন অসময়ে ঘুমাইতেছে কেন?

চাকরটি বলিল—অসময় তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহাদের এ ঘুম আর ভাঙিবে না।

—সে কি? ইহারা কে?

—ইহারা মৃত এবং মৃত চিকিৎসক।

—মরিল কেমন করিয়া?

—চিকিৎসা করিতে গিয়া।

—চিকিৎসায় তো রুগী মরে।

—কখনো কখনো চিকিৎসকও মরে—প্রমাণ সম্মুখেই।

এই সব বাক্য বিনিময়ে আমার চিত্ত উচাটন হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম—ব্যাপার কি খুলিয়া বলো।

সে বলিল—বুঝাইবার বিশেষ আবশ্যক আছে কি? হয় তো জীবন দিয়াই আপনাকে বুঝিতে হইবে। জমিদারবাবু বড়ই প্রচণ্ডস্বভাবের লোক। চিকিৎসায় আরোগ্য করিতে পারিলে তিনি চিকিৎসককে প্রচুর ধনরত্ন দিবেন ইহা যেমন সত্য, তেমনি চিকিৎসক ব্যর্থকাম হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন ইহাও তেমনি সত্য—প্রমাণ তো নিজেই দেখিলেন।

—আগে আমাকে এ কথা বলা হয় নাই কেন?

—তাহা হইলে কি আর আপনি চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইতেন?

—কিন্তু চিকিৎসক মারিয়া ফেলার ইতিহাস তো কখনো শুনি নাই।

—জমিদারবাবুর ধারণা আনাড়ি চিকিৎসক যমের দূত। তাহাদের মারিয়া ফেলিলে যমের পক্ষকে দুর্বল করিয়া রুগীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। কই আসুন—

আমি ততক্ষণে জানালার শিক ভাঙিয়া, পগার ডিঙাইয়া ছুটিয়াছি—আমাকে ধরিবে কে? যদিচ পিছনে আট-দশটি পাইক পেয়াদা দৌড়াইয়াছে দেখিতে পাইলাম। এক ছুটে সরাইখানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিল; তারপরে বলিল—আজ আমাকে এই স্যাঁৎসেতে মেঝেতেই শুইতে হইবে, তা হোক। আমের কাঠের চেয়ে এই ভেজা মেঝে অনেক ভালো।

এবার সাহিত্যিকের পালা। সে বলিল—কি আর বলিব! খুব বাঁচিয়া গিয়াছি—বন্ধু চিকিৎসকের মতো আমিও মৃত্যুর খিড়কি দরজার কাছে গিয়া পড়িয়াছিলাম—নেহাৎ পরমায়ুর জোরেই এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি।

সকলে উৎসুক হইয়া শুধাইল—ব্যাপার কি খুলিয়া বলুন।

সাহিত্যিক বলিয়া চলিল—পূর্বদিকের পথ দিয়া গ্রামে গিয়া তো প্রবেশ করিলাম। সে দিক্‌টায় রজকপল্লী। রজকপল্লী দেখিলেই আমার রজকিনী রামীকে মনে পড়িয়া যায়, কোন্ সাহিত্যিকের না যায়? রজক কিশোরীদের লক্ষ্য করিতে করিতে চলিয়াছি—হ্যাঁ—চণ্ডীদাস রসিক ছিল বটে, সজোরে পাথরের উপরে কাপড় আছড়াইবার ফলে দুই বাহু ও সংলগ্ন কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন সুপুষ্ট হইয়া ওঠে যে, অপরের প্রশস্ত নীল শাড়িও তাহা আবৃত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষ কাপড় আছড়াইবার সময়ে উক্ত প্রত্যঙ্গদ্বয় শরীরের তালে

তালে শূন্যে বৃথা মাথা কুটিয়া মরিতে থাকে তাহা দেখিয়া কোন্ পুরুষের মন না ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে—সাহিত্যিকদের তো কথাই নাই। এমন সময়ে একটি রজক কিশোরী আমাকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—ফিরিয়াছে, ফিরিয়াছে।

ফিরিয়াছে? কে ফিরিয়াছে? হ্যাঁ, ফিরিয়াছে বই কি? আমার মধ্যে দিয়া চিরদিনকার চণ্ডীদাস ফিরিয়া আসিয়াছে—রজকিনী রামীর শীতল পায়ে বুঝিলাম জগতে দুটি মাত্র প্রাণী আছে—আমি চণ্ডীদাস আর কিশোরী রজকিনী রামী। দেখিতে দেখিতে আমার চারিদিকে একদল কিশোরী জুটিয়া গেল—জগৎ রামীময়, আর তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল জগৎ আমিময়। এ রকম অবস্থায় কবিতা না লিখিয়া উপায় কি?

একজন বলিল—ফিরিয়াছে।

(ফিরিয়াছে বই কি! না ফিরিয়া কি উপায় আছে?)

আর একজন বলিল—অনেকদিন পরে।

(সত্যিই তো! চণ্ডীদাসের পরে আজ কত যুগ গিয়াছে।)

তৃতীয়া বলিল—ঠিক সেই চেহারা, ঠিক সেই হাবভাব।

(এমন তো হইবেই। মানুষ বদলায়, প্রেমিক কবে বদলিয়াছে?)

চতুরা বলিল—কেবল যেন একটু রোগা মনে হয়। (ওগো শুধু রোগা হওয়া নয়—এযে অনিবার্য বিরহসঞ্জাত-কৃশতা।)

পঞ্চমী কিছু বলিল না—কেবল আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিল।

(ওগো বৈষ্ণব কবি, তুমি প্রশ্ন করিয়াছিলে অঙ্গের পরশে কিবা হয়। আজ আমারও ঠিক সেই প্রশ্ন।)

অপরা বলিল—কিন্তু লেজটা যেন কাটিয়া দিয়াছে?

লেজ? কার লেজ? এবার চণ্ডীদাস-থিওরিতে সন্দেহ জন্মিল।

এবারে আমি প্রথম কথা বলিলাম—আমি প্রেমিক চণ্ডীদাস।

তাহারা সমস্বরে বলিল—হাঁগো হাঁ, তাহার ঐ নামই ছিল বটে।

এই বলিয়া একজন একটা কাপড়ের মোট আনিয়া আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিল।

আমি বলিলাম—আমি তো চাকর নই।

তাহারা বলিল—চাকর হইতে যাইবে কেন? তুমি যে গাধা।

আমি গাধা।

বলিলাম—সে কি? আমি যে মানুষের মতো কথা বলিতে পারি।

রসিকা বলিল—অনেক মানুষ গাধার মতো কথা বলে, একটা গাধা না হয় মানুষের মতো কথাই বলিল—আশ্চর্যটা কি?

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—আরে, আরে, আমি যে সাহিত্যিক?

—তবে আর তোমার রাসভত্বে সন্দেহ নাই—কারণ যাহারা মধুর স্বাদ নিজে গ্রহণ না করিয়া কবিতার ব্যাখ্যা করিয়া মরে—তাহারা যদি গাধা না তবে গাধা কে?

তখন অপর এক কিশোরী বলিল—ও দিদি, এ যে বশ মানিতে চায় না—কি করি?

কিশোরীর দিদি যুবতী বলিল—প্রেমের ডুরি খানা আন তো?

প্রেমের ডুরি শুনিলেও দেহে রোমাঞ্চ হয়।

দেখিতে পাইলাম একজন মোটা একটি কাছি আনিতেছে।

তবে ওরই নাম প্রেমের ডুরি। ও ডোর ছিঁড়িবার সাধ্য তো আমার হইবেই না—এমন কি পাড়াশুদ্ধ লোকের হইবে না। তখনই ছুট। কিশোরীরা দৌড়ায় বেশ। প্রায় ধরিয়াছিল আর কি? উঃ, পথ বিপথ লক্ষ্য করি নাই—এই দেখুন হাঁটুর কাছে ছড়িয়া গিয়াছে, কাপড়টা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তবু ভালো যে প্রেমের ডুরিতে বদ্ধ হই নাই।

এই বলিয়া সে থামিল; তার পরে বলিল—তবু ভালো যে আজ ভিজা মেজেতে শুইতে পাইব, প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়িলে গোয়ালে ঘুমাইতে হইত।

তাহার কাহিনী শেষ হইলে সকলে মিলিয়া সিনেমা স্টারের অভিজ্ঞতা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চতুর্থ পথিক তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে সুরু করিল।

বন্ধুগণ, আমি পশ্চিমদিকের পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখি একটি পুকুরের ধারে একটি মেলা বসিয়াছে। স্থান কাল পাত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে সামাজিক ধাপে আমার জীবনের মূল্য বিচারের ইহাই যথার্থ স্থান। আমি তখন পুকুরের জলে নামিয়া ডুবিয়া মরিতে চেষ্টা করিলাম। আপনারা ভয় পাইবেন না, সহস্রবার ডুবিয়াও কি করিয়া না মরিতে হয় তাহার কৌশল আমাদের আয়ত্ত। ডুবিয়া মরিবার চেষ্টা অভিনয় মাত্র। আমি সকলকে ডাকিয়া বলিলাম—আমি ডুবিয়া মরিতেছি, তোমরা আমাকে বাঁচাও! আমার আর্ত আহ্বান শুনিয়া সকলে পুকুরের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কেহ জলে নামিল না।

আমি বলিলাম—আমি ডুবিলাম বলিয়া—শীঘ্র বাঁচাও।

তাহারা বলিল—আগে তোমার পরিচয় দাও তবে জলে নামিব।

আমি বলিলাম—আমি একজন মানুষ। বাঁচাইবার পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট নয়?

তাহারা বলিল—আমরা সবাই তো মানুষ। কেবল আইনে বাধে বলিয়া পরস্পরকে মারিয়া ফেলিতে পারিতেছি না—সদয় বিধাতা আইনের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে যখন মারিবার ব্যবস্থাই করিয়াছেন—তখন তোমাকে আমরা বাঁচাইতে যাইব কেন?

আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম—আমি শিক্ষক।

তাহারা এক বাক্যে বলিল—জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেয়ে তোমার ডুবিয়া মরাই ভালো।

আমি বলিলাম—আমি চিকিৎসক।

তাহারা বলিল—অনেক মারিয়াছ, এবারে মরো।

—আমি সাহিত্যিক।

—ডুবাইতে পারো আর ডুবিতে পারো না?

—আমি সাংবাদিক—শুনিয়া তাহারা ঢেলা মারিল।

—আমি সাধুপুরুষ—শুনিয়া তাহারা হাসিল।

—আমি বৈজ্ঞানিক—শুনিয়া তাহারা সাড়া শব্দ করিল না।

—আমি গায়ক—শুনিয়া কেহ কেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আমি খেলোয়াড—শুনিয়া দু-একজন জলে নামিতে উদ্যত হইল।

—আমি চলচ্চিত্র অভিনেতা।

তাহারা বুঝিতে পারিল না। তখন বলিলাম—যাহার বাংলা হইতেছে 'সিনেমা স্টার'।

ইহা শুনিবামাত্র মেলার সমস্ত জনতা একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। পুকুরের জল স্ফীত হইয়া উঠিয়া মেলার জিনিষ পত্র ভাসাইয়া লইয়া গেল।

সকলেরই মুখে—হায় হায়! গেল গেল! দেশ ডোবে, জাতি ডোবে, সমাজ ডোবে, রাজ্য সাম্রাজ্য সভ্যতা আদর্শ ডোবে তাহাতে ক্ষতি নাই—কেবল সিনেমা স্টার ডুবিলে সমস্ত গেল! হায়, হায়! গেল, গেল!

সকলে মিলিয়া আমাকে টানিয়া তুলিয়া ফেলিল। সকলে অর্থাৎ আবাল বৃদ্ধ নর নারী যুবক যুবতী বালক বালিকা কিশোর এবং কিশোরী।

আমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আমার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাপ জোক লইতে আরম্ভ করিয়া দিল। পা হইতে মাথা পর্যন্ত—নানাস্থানের মাপ। তারপরে চুলের রং, ঠোটের রং, নখের রং, দাঁতের রং, চোখের রং। এ সব টোকা হইয়া গেলে আমার জীবনেতিহাসের খুঁটিনাটি লইয়া প্রশ্ন সুরু করিল। আমাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। আগামী কল্য তাহাদের সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ কবিব এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তবে ছাড়া পাইয়া আসিয়াছি।

চতুর্থ পথিকের অভিজ্ঞতা শুনিয়া অপর তিনজনে বুঝিতে পারিল আজ রাত্রে তক্তপোষে শুইবার অধিকার কাহার।

চার বন্ধুতে আহারান্তে শয়ন করিল। সিনেমা স্টার তক্তপোশে শুইল—অপর তিনজনে সেই ভেজা মেঝের উপরে।

তক্তপোশশায়ী সিনেমা স্টারের নিদ্রার তালে তালে যখন নাসিকা গর্জন চলিতেছিল, তখন তিনজনে মশা, মাছি, ছুচো, ইঁদুর প্রভৃতি তাড়াইয়া বিনিদ্র-নিদ্রায় রাত্রি কাটাইতেছিল। সারারাত ছুচোগুলো চিক্ চিক্ করিয়া ঘরময় দৌড়িয়া বেড়াইল—তিনজনের কানে তাহা বিদ্রূপের ফিক ফিক হাসির মতো বোধ হইল। ঘরেব একপ্রান্তে একটা সাপের খোলস পড়িয়া থাকা সত্বেও তাহারা নির্বিঘ্নে রাত্রি অতিবাহিত করিল! কপালে যাহাদের দুঃখ সাপেও তাদের স্পর্শ করে না।

একটি ঠোঁটের ইতিহাস

বিশ্বকর্মা যে-ঘরটাতে বসিয়া মূর্তি তৈয়ারি করেন, সে-ঘরটা সর্বদা তালা চাবি বন্ধ থাকে। যখন তিনি শিল্প কার্য করিতে থাকেন, ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেন। বাহিরে গেলে শক্ত তালা চাবি আঁটিয়া যান। এমন কি দু'চার দণ্ডের জন্যে বাহির হইলেও তালা চাবি আঁটিতে কখনো ভোলেন না। তাঁহার ছোট ছেলেটিকে বড়ো ভয়। নাবালক ছেলেটা সর্বদা গুলতি তৈরি করিবার জন্যে নরম মাটি খুঁজিয়া বেড়ায়, আর পিতার শিল্প শালার মতো এমন তৈরি কাদার তাল আর কোথায় সুলভ! কিন্তু বিশ্বকর্মার বয়স হইয়াছে। একদিন ঘর বন্ধ না করিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, ঠিক সেই অবসরে ছোট ছেলেটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। একটা সম্পূর্ণপ্রায় মূর্ত্তি পড়িয়াছিল; গুলতির মাটির লোভে সে তার ঠোঁটে যেমনি হাত দিয়াছে, অমনি বিশ্বকর্মার আওয়াজ কাণে গেল,—'ঘরে কে রে? নন্তু বুঝি, দাঁড়া আসছি।' গুলতি সংগ্রহ আর হইল না, নন্তু এক দৌড়ে পালাইল। বিশ্বকর্মা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন সব ঠিক আছে। নন্তুর হাতের চাপে মূর্তির নীচের ঠোঁট-টা যে একটু বাঁকিয়া গিয়াছে—তাহা আর বুড়া বিশ্বকর্মার ক্ষীণ দৃষ্টিতে পড়িল না। তারপরে যথাসময়ে সেই মূর্তি জেলা মেদিনীপুরের গোবিন্দ মণ্ডলের ঘরে আকাট মণ্ডল রূপে ভূমিষ্ট হইল। এই গল্প সেই আকাট মণ্ডলের কাহিনী কিংবা আরও বিশিষ্টভাবে বলিতে গেলে বিশ্বকর্মার অসাবধানতায় এবং নন্তুর গুলতির লোভে তাহার ঠোঁট যে ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছিল—ইহা তারই ইতিহাস। একটি তরল মতি বালকের জন্যে সারা জীবন একটা মানুষকে

কত দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছিল—তাহা শুনিলে পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, অপরাধ করিলেন বিশ্বকর্মা আর ফল ভোগ করিল নির্দোষ আকাট মণ্ডল। নস্তুকে দোষ দিয়া লাভ নাই—সে বালকমাত্র—ফলাফল বিচার তাহার স্বভাব নয়।

আকাট মণ্ডলের জন্মের কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার জননীর মৃত্যু হইল। রাগে দুঃখে গোবিন্দ মণ্ডল ঘর হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে সদ্যোজাত শিশুর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। গোবিন্দ মণ্ডল বলিয়া উঠিল—'দেখনা, বেটা মাকে মেরে ফেলেছে, আবার হাসছে!' সত্য সত্যই আকাটের দন্তহীন শিশু মুখে একটা হাসির আভা লাগিয়া ছিল। পার্শ্ববর্তীরা তাকাইয়া দেখিল এবং বিস্মিত হইল। সকলেই মনে মনে বুঝিল—এ ছেলে অপয়া।

বিচক্ষণ পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে হাসিটি শিশুর স্বেচ্ছাকৃত নয়। ওই যে নস্তুর হাতে তাহার নাচের ঠোটে একটু চাপ লাগিয়াছিল, তার ফলে ঠোঁট-টা এমন ভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে—যাহাতে বিদ্রূপ-সঞ্জাত একটা হাসির ছাপ ওখানে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। এ হাসি যেমন তাহার স্বেচ্ছাকৃত নয়, তেমনি তাহা দূর করিবার শক্তিও তাহার নাই, বস্তুতঃ ওটা হাসিই নয়। কিন্তু সংসারের সকল মানুষতো আর আমার পাঠকের মতো বিচক্ষণ নয়, তাহারা এত তলাইয়া বুঝিতে চায় না; সে শক্তি, সে ইচ্ছা তাহাদের নাই। তাহারা ওটাকে হাসি বলিয়াই মনে করিতে লাগিল—এবং তাহাদের ভুল বোঝার ফলাফল ভোগ করিতে করিতে আকাট মণ্ডল জীবন যাপন করিতে সুরু করিল।

গোবিন্দ মণ্ডল আকাটকে বেশিদিন বাড়ীতে রাখিল না। দ্বিতীয়-বার বিবাহ করিবার কয়েকদিন আগে তাহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিল। আর আনিল না। মাতুলরা ধার্মিক, ধর্মের পুরস্কারস্বরূপ

আকাটকে লাভ করিল। তাহাদের অনেকগুলি গোরু ছিল, রাখাল ছিল না, আকাট রাখালের কাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু এমন করিয়া তো চলে না। পাড়ার লোকেরা নিতান্ত অধার্মিক—ভাগ্নেকে দিয়া রাখালের কাজ করানো তাহাদের ভাল লাগিল না; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল। কাজেই ধার্মিক মাতুলগণ তাহাকে পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিল—বলিল, দেখো, ভাগ্নে ও ছেলের মধ্যে আমরা কোন ভেদ করি না। কিন্তু তাহার গোচারণের খ্যাতি গুরুমহাশয়ের কানে উঠিয়াছিল, তিনি আকাটকে বলিলেন—ওরে তুই মাঠে গিয়ে আমার গরুগুলো দেখ্। ওতেই হবে বাবা, গুরুর আশীর্বাদে ওতেই তোর বিদ্যা হবে। অতএব আকাট পুনরায় মাঠে গেল। পড়িবার সময়ে সে গোরু চরায়, এমনি করিয়া কয়েক বছর গোরু চরাইবার পরে গোরুর চড়া দাম দেখিয়া গুরুমহাশয় গোরুগুলি বেচিয়া দিলেন। তখন আর আকাটের প্রয়োজন নাই দেখিয়া গুরুমহাশয় মাতুলদের বলিলেন আকাটের পড়া শেষ হইয়াছে। মাতুলরা তাহাকে পাশের গ্রামের হাইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিল।

সেই স্কুলে গিয়া প্রথম দিনেই তাহার বাঁকা ঠোঁট তাহাকে বিপদে ফেলিল। পণ্ডিতমহাশয় ক্লাসে ঢুকিয়াই তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কিরে বড়ো যে হাসছিস্। সে বলিল—কই পণ্ডিতমশাই, হাসছি কই? তবে রে বেটা মিথ্যাবাদী। এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। যাইবার সময়ে বলিলেন—তোর কিছু হবে না, বেটা আকাট মুখ্যু। সেই হইতে পিতৃদত্ত নামটার পরিবর্তে গুরুদত্ত ওই বিশেষণটা তাহার গায়ে আটকাইয়া গেল। লোকে তাহাকে আকাট বলিয়াই ডাকিতে ডাকিতে ক্রমে মৌলিক নামটা ভুলিয়াই গেল। আমরাও তাহাকে ওই নামেই উল্লেখ করিয়া আসিতেছি।

এই ঘটনার পর হইতে তাহার উপরে পণ্ডিতমহাশয় কেমন যেন জাত ক্রোধ হইয়া গেলেন। তিনি ক্লাসে ঢুকিয়াই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—'কিরে হাসছিস্ যে বড়ো।' আকাট বলিত—'কই হাসলাম পণ্ডিতমশাই!' পণ্ডিতমশাই ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিতেন—দেখ তোরা ও হাস্‌ছে কিনা। সহপাঠীগণ তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিত আকাটের মুখে হাসিই বটে। একদিন ব্যাপারটা লইয়া একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। ফলে পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে খুব এক চোট মারিলেন। আকাট কাঁদিতে লাগিল। তখন তিনি ছাত্রদের ডাকিয়া বলিলেন, দেখেছিস বেটার বজ্জাতি। চোখে জল কিন্তু মুখের হাসিটি যায়নি—এমন শয়তানকে ইস্কুলে রাখবো না। যা দূর হয়ে যা। আকাট সেদিনের মত ইস্কুল ত্যাগ করিল এবং পরেও আর ইস্কুলে গেল না। তাহার পড়াশোনা ওইখানেই শেষ হইল।

অতঃপর আকাট চাকুরির সন্ধানে কলিকাতায় আসিল। একটি সাহেবী অফিসে চাকুরি পাইল। Liftএর দরজা খোলা ও বন্ধ করা তাহার কাজ। সারাদিন এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে liftএর দরজা খুলিযা দেয়; আবার লোক উঠিলে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়; lift হুস করিয়া পাতালপুরীতে নামিয়া যায়। এই ভাবে তাহার কাল যায়—হঠাৎ তাহার একদিন সৌভাগ্যোদয় হইল। একদিন lift হইতে বাহির হইয়া তাহার দিকে বড়ো সাহেবের চোখ পড়িল। তিনি বলিয়া উঠিলেন 'I like Such a Smiling face' এরকম Smiling face নাকি ইণ্ডিয়াতে সদাসর্বদা চোখে পড়ে না। বড়ো সাহেব তাহাকে তাঁহার খাস খানসামার কাজ দিলেন। মাহিনাও অবশ্য বাড়িল। আকাট ভাবিল বিধাতা এতদিনে প্রসন্ন হইয়াছেন কিম্বা বিধাতা বরাবরই প্রসন্ন কেবল মানুষের অন্যায় অত্যাচারের জন্যই তাহার যত কষ্ট। সে

বিধাতাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া মানুষকে মনে মনে বাপান্ত করিয়া, নূতন কোট ও চাপরাশ পরিয়া বড়ো সাহেবের দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু বেশিদিন দাঁড়াইয়া রহিতে হইল না। সেদিন বড়ো সাহেব তাহার মেমের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আফিসে আসিতেছিলেন দরজার কাছে আকাটকে দেখিয়া গর্জিয়া উঠিলেন—Grinning Idiot! এবং গর্জনের পিছনে শিলাবর্ষণের মতো একটি প্রচণ্ড ঘুষি তাহার নাকে আসিয়া পড়িল।

এখন সাহেবী অফিসের একটি সুনিয়ম এই যে এরকম চড় ঘুষিটা খাইলে অন্যত্র তাহার ঔষধ সন্ধান করিতে হয় না। সরকারী খরচে ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই অফিসের ডাক্তার আকাটের নাকে একটি পটি বাঁধিয়া দিল। দেশী আফিসে এমন বিধান শৃঙ্খলা নাই। সেখানে চড়-চাপড় খাইলে নিজের খরচে ঔষধ সংগ্রহ করিতে হয়।

পটি বাঁধা নাক, আকাট অসুখের বাবদ তিনদিন ছুটি পাইল। সে বাসায় ফিরিয়া ভাবিতে লাগিল, কেন এমন হইল? বিধাতাপুরুষ তো অবিবেচক নহেন, সাহেবও সদয়, তবে তাহার নাকটা বদ্ধপটি হইল কেন? এমন সময়ে নাকে ঔষধ লাগাইবার প্রয়োজন হইলে সে ঔষধের তুলি লইয়া আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আয়নার ভিতরে হাসিতেছে কে? সে চমকিয়া উঠিল! তার নিজেরই তো ঠোঁট বটে! এদিকে নাকটা জ্বলিয়া যাইতেছে; ঠোঁটের হাসি সেই জ্বলুনিকে যেন চতুর্গুণ বাড়াইয়া দিল। আর একটু হইলেই সে নিজের গালে এক চড় বসাইয়া দিয়াছিল আর কি! সে রাগে দুঃখে আয়নার সুমুখ হইতে সরিয়া আসিল। সরিয়া আসিল বটে কিন্তু সেই বিদ্রূপের হাসিটা মন হইতে কিছুতেই সরিল না। সে নিজেকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ

করিল—এবং প্রতিদিনের স্তূপীকৃত ধিক্কার জমিয়া উঠিয়া এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিল যাহার আড়ালে ওই হাসিটা প্রচ্ছন্ন হওয়া দূরে থাকুক, তাহার উর্ধোৎক্ষিপ্ত শিখরের তুষারের শুভ্রতায় সেই বিদ্রূপের হাসির নির্জীব ছটা অনির্বাণ হইয়া জ্বলিতে লাগিল। এতদিন তাহাব হাসি দেখিয়া অপরে বাগিত, এবার তাহার নিজের বাগিবার পালা, নিজের উপরে। সারাদিন ওই হাসি। আবার ঘুমের মধ্যেও ওই হাসিটা নিঃশব্দ বিভীষিকা সঞ্চার করিয়া তাহার স্বপ্নকে পীড়িত করিতে থাকে। স্বপ্ন ও জাগরণের ভীতির সাঁড়াশি আক্রমণে আকাট পাগল হইয়া যাইবাব মতো হইল।

কিন্তু সে পাগল হইল না। তার কারণ সংসারে পাগলামিব একমাত্র ধন্বন্তরি ঔষধ সে পান করিয়া বসিল। আকাট বিবাহ করিল। বিবাহের পরে কিছুকাল ভালই চলিল। বিবাহেব পরে কিছুকাল ভালই চলে। তখন তো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বাস্তবরূপ দেখে না, পরস্পরের স্বপ্ন দেখে। যতদিন স্বপ্ন চলে, কোন বালাই থাকে না, কাবণ স্বপ্ন চালনার কোন খরচ নাই। কিন্তু ক্রমে স্বপ্ন কাটিয়া আসিতে থাকে, আব বাস্তব-রূপ ধীরে ধীরে চোখে পড়িতে আরম্ভ করে।

এতদিন আকাট তাহার পত্নীর স্বপ্ন দেখিতেছিল, সেদিন মোক্ষদা-সুন্দরীকে চোখে পড়িল। মোক্ষদাসুন্দরী তাহার স্ত্রীর নাম বটে। মোক্ষদাকে চোখে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আকাট দেখিল তাহার একটা নাক আছে, আর নাকে আছে একটা মস্ত নথ।

ওদিকে মোক্ষদারও চোখে পড়িল—তাহার স্বামীর ঠোঁটে একটা বিদ্রূপের হাসি। মোক্ষদা ভাবিল ওই হাসিটা নিশ্চয় তাহার নথটা লক্ষ্য করিয়া। কারণ অনেক স্থানেই তাহার নথটা হাসি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সে কখনো ভাবিতে পারে নাই তাহার স্বামীও এটা লইয়া বিদ্রূপ করিবে।

সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল—বড় যে হাসছ! একটা দিতে তো পারো না।

স্বামী বলিল—হাসলাম আবার কই?

স্ত্রী বলিল—আমি যেন কিছু বুঝি না! বয়স কত অনুমান করো!

এখন মোক্ষদার বয়স লইয়া একটু গোলমাল ছিল। তাহার বয়স পিতৃপক্ষ কম বলিয়া চালাইয়া দিয়াছিল। এটা এমন নূতন কিছু নহে। পুরুষের বয়স চাকুরীর খাতায় কম করিয়া লিখানো হয়। আর মেয়েদের বয়স বিবাহের বেলায়।

স্বামী-স্ত্রীতে এই ঝগড়া স্বরু হইয়া গেল। কোন স্বামী-স্ত্রীতে না ঝগড়া না হয়। এখনকার দিনে যমুনা পার হইয়া মথুরায় গিয়া বিরহ যাপনের স্থবিধা নাই। দাম্পত্য ক্রোধের কুটিলা গতিই এখন যমুনার কাজ করে। কাজ করিবার ফলে উভয়ে কিছুদিন (কয়েক ঘণ্টাও হইতে পারে) মাথুর পালা উদ্‌যাপন করে—তারপরে আবার ভাব-সম্মিলন।

কিন্তু সাধারণ স্ত্রীর তুলনায় মোক্ষদাসুন্দরী কিছু বেশি অভিমানী, বিশেষ তার দুর্বল স্থান ওই নথটা। নথটা নাকি তাহার পরলোকগতা মাতার সম্পত্তি, তাই বিশেষ যত্নে সে নাকে ধারণ করিত, অবশ্য পাকা সোনায় তৈরী—সেটাও অন্যতম কারণ।

একদিন গভীর রাত্রে মোক্ষদা ঘুম ভাঙিয়া দেখিল তাহার স্বামীর ঠোঁটে সেই বিদ্রূপের হাসি। ভাবিল স্বামী নিদ্রিতা পত্নীর নাকে নথটা দেখিয়া হাসিতেছিল—এখন ঘুমের ভান করিতেছে। আকাট সত্যই ঘুমাইতেছিল—হাসিটা তাহার স্বাভাবিক—অর্থাৎ অস্বাভাবিক। স্ত্রী তাহাকে ডাকিয়া জাগাইল। বলিল—ঘুমিয়েও কি একটু শান্তি পাবো না?

আকাট বলিল—অশান্তি কি? ঘুমোও না।—ঘুমোও না! তোমার কি হচ্ছিল?

আকাট বলিল—ঘুম !

—বটে। আর মিথ্যে বল্‌তে হবে না। আমি সব বুঝি !

সে যে কি বোঝে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিল না বটে, কিন্তু পরদিনই সে বাপেরবাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে শ্বশুরবাড়ীর যাবতীয় অস্থাবর লইয়া গেল। কেবল স্থাবর বলিয়া বাড়ীটি লইতে পারিল না।

আকাট বুঝিল যে তাহার দাম্পত্য-জীবন শেষ হইল। ওই বিদ্রূপের হাসিটাই ইহার মূল। তখন সে লোটা কম্বল লইয়া, গেরুয়া পরিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া সংসার ছাড়িল।

আকাট্ শুনিয়াছিল সন্ন্যাসীরা বনে যায় কিন্তু বন যে ঠিক কোথায় তাহা সে জানিত না। বাংলা দেশের লোকে সুন্দরবনের নাম জানে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের নামটাও জানে। সন্ন্যাসীর প্রতি বাঘের আচরণ কি রকম সে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা আকাটের হইল না। কাজেই সে হাওড়া স্টেশনে গিয়া বিন্ধ্যাচলের একখানা টিকিট করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ীখানা তৃতীয় শ্রেণীর। তার একান্তে দুইজন সাহেবী পোষাক পরিহিত যুবক সিগারেট টানিতে টানিতে ইহলোক, পরলোক, সন্ন্যাস, সংসার আশক্তি, 'ত্বয়া, হৃষীকেশ', 'মাফলেষু,' ইত্যাদি গভীর বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। এসব আলোচনার অধিকার তাহাদের আছে, কারণ তাহারা জীবন-বীমার দালাল। এখনি বর্ধমানে নামিয়া জীবন-বীমার শিকার সন্ধান সুরু করিবে।

যুবকদের মধ্যে ক বলিল—ভোগের দ্বারাও ত্যাগের ভূমিকা সৃষ্টি করতে হয়। ভোগ না করিলে ত্যাগ করা যায় না।

'খ' বলিল—ত্যাগই যদি করতে হয় তবে আবার ভোগের উৎপাত সৃষ্টি কেন ?

'ক' বলিল—মেঘ না হলে কি বৃষ্টি সম্ভব? মেঘটা সঞ্চয়—বৃষ্টি ত্যাগ!

'খ' বলিল—আমাদের দেশে কত সাধু-সন্ন্যাসী আছেন—সবাই কি ভোগী ছিলেন?

'ক' বলিল—যে-সব সাধু-সন্ন্যাসী এক সময়ে ভোগী ছিলেন—তাঁরাই ত্যাগে শান্তি পেয়েছেন। যাঁরা ভোগের বস্তুর অভাবে সংসার ত্যাগ করেছেন তাঁদের cynic বলা যেতে পারে।

এমন সময়ে 'ক'-র দৃষ্টি আকাটের দিকে পড়িল—এবং তাহার ঠোঁটের বিদ্রূপের হাসিটি সে দেখিতে পাইল।

তখন সে 'খ'কে ডাকিয়া বলিল—ওই দেখ এক গেরুয়াধারী। কিন্তু ওর ঠোঁটের বিদ্রূপের হাসিটা লক্ষ্য করেছ? ওর ভোগের মূল ক্ষয় হয়নি। ভোগের ইচ্ছা ওর ষোল আনা আছে, কিন্তু সংসার ওর সম্বন্ধে কৃপণ। ওই হাসি দিয়ে সে সংসারকে ধিক্কার দিচ্ছে।

'খ' সমস্তই দেখিল। এমন চাক্ষুষ প্রমাণের পরে আর তর্ক চলে না। তাই সে একটি সিগারেট ধরাইল।

আকাট দেখিল সে আবার ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বিন্ধাচল যাওয়া তার আর হইল না। সে 'খানা জংশনে' নামিয়া পড়িল। স্টেশনের পাশে এক বটগাছতলায় সে আস্তানা পাতিল। কিন্তু গেরুয়া একেবারে ব্যর্থ হইবার নয়। সন্ন্যাসী দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহার শিষ্য জুটিতে সুরু করিল। তাহার শিষ্যরাও সেই হাসিটি লক্ষ্য করিল—তাহারা গুরুর নাম দিল 'হাসিয়া বাবা'।

সারা জীবন সে হাসির কুফল ভোগ করিয়া আসিয়াছে—এইবারে হাসির সুফল ভোগ করিবার তাহার পালা। শুধু সুফল নয় সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, সন্দেশও ছিল। বিধাতাপুরুষকে একেবারে নির্দয় বলা যায় না—ওই অনিচ্ছাকৃত হাসিটি যদি তিনি দিয়া থাকেন,

তবে তাহার বাবদ এবার অমৃতবণ্টনও তিনিই করিলেন। সুখে দুঃখে, শীতে গ্রীষ্মে, দিনে রাত্রে তাহার মুখে হাসি লাগিয়া আছে—ইহাই হইল তাহার সব চেয়ে বড় মাহাত্ম্য। হাজার হাজার বছরের দুঃখে কষ্টে যে দেশের লোক হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে—তাহারা ওই হাসির ছটায় আধ্যাত্মিক স্বর্গের চরম দীপ্তি দেখিতে পাইল। এবং তাহার ফল স্বরূপ আকাটের বৃক্ষতলাশ্রিত আস্তানা অচিরকালের মধ্যে সুবৃহৎ মন্দিরে পরিণত হইল। ইহাতে বিধাতাপুরুষ বিস্মিত হইলেন কিনা জানি না, তবে আকাট হইল। কিন্তু অনেক ঠেকিয়া তাহার শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল—তাই সে কিছু প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর হইয়া চাপিয়া বসিয়া রহিল। এইভাবে দীর্ঘকাল 'খানা জংশনে' সে কাটাইল। তাহার নাম ও খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—কাজেই বহু লোকের মোহ মুক্তির দলস্বরূপ বহুতর ভূসম্পত্তি ও অস্থাবর সঞ্চয় করিয়া অবশেষে একদিন 'হাসিয়া বাবা' দেহরক্ষা করিল।

এইরূপে আকাট মণ্ডলের জীবন শেষ হইল। কিন্তু একেবারে শেষ হইল না। শিষ্যরা গুরুর দেহ সমাধিস্থ কবিয়া তাহাব উপরে প্রকাণ্ড এক মঠ তৈয়ারী করিয়া দিল—তাহার নাম দিল 'হাসিয়া বাবার মঠ।'

হাসিয়া বাবা স্বর্গে গেল। নন্তুর বালকসুলভ অনবধানতায় সারা জীবন যে দুর্ভোগে ভুগিয়াছে—তাহাই সে বিধাতার কাছে নালিশ করিল। বিধাতা নথীপত্র দেখিয়া ন্যায়বিচার করিলেন। আকাটের পুণ্যফল নন্তুর হিসাবে জমা করিয়া দিলেন—কারণ নন্তুই তাহার পুণ্যের কারণ। আর আকাটের মাটির পিণ্ডটাকে চটকাইয়া শিল্প শাখার একান্তে ফেলিয়া রাখিলেন—নূতন মূর্তি তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে! ইহার পরেও কে বলিবে যে বিধাতাপুরুষ নিরপেক্ষ নহেন।

প্র. না. বি-র সঙ্গে কথোপকথন

বহুকালের বাসনা ছিল জগদ্বিখ্যাত লেখক প্র. না. বি-র সঙ্গে একবার দেখা করিব। কলিকাতায় তাঁহার সন্ধান না পাইয়া who's who পরিচয় গ্রন্থে দেখিলাম তিনি মধুপুরে থাকেন। মধুপুরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। স্টেশন হইতে তাঁহার বাড়ী যাইতে কোন অসুবিধা হইল না, ছোট জায়গায় বড় লোক থাকিলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নয়।

তাঁহার বাড়ী পৌছিয়া শুনিলাম তিনি শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন—এখনি ফিরিবেন। চাকরে আমাকে একটি কক্ষে বসাইল। শীতকাল। সকালবেলা। ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে বাহিরে রোদে বেড়ানো আরামজনক। বাগানের মধ্যে ঘুরিতে লাগিলাম। বিস্তৃত বাগানের মধ্যে প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীটা বড় বলিলে বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় না—এ যেন একটা দুর্গ। রাজপুতানার একটা মরু-দুর্গ সশরীরে তুলিয়া আনিয়া সাঁওতাল পরগণার মাঠের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

বাগানে আম গাছ, পেয়ারা গাছ, আতা গাছ; তা ছাড়া বড় বড় শাল, মহুয়া, হরীতকীও প্রচুর। ফুলের গাছের মধ্যে গাঁদা—জলন্ত ফুলে উজ্জল। প্রাচীরের গা দিয়া একসার স্থলপদ্মের গাছ। স্থলপদ্মের সময় শরৎকাল—কিন্তু তখনো কিছু কিছু ফুল ছিল। মাঝখানে শ্বেতপাথরের একটা বেদী। সেই বেদীতে গিয়া বসিলাম।

এমন সময়ে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল—বাবু আসিয়াছেন। আমি তাহাকে অনুসরণ করিয়া পূর্ববর্ণিত সেই কক্ষে গিয়া পৌছিলাম। কিন্তু

কক্ষের মধ্যে এ কে? সাত ফুট লম্বা, ব্রিচেস্-পরা, চাপ দাড়ি গালের দুইদিকে ভাজ করিয়া তুলিয়া দেওয়া প্রৌঢ় এক ব্যক্তি! পাতিযালা বা আলোয়ারের মহারাজা হইলেও হইতে পারে।

উক্ত ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া আমার করমর্দন করিয়া বলিলেন—আমার জন্য আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'য়েছে, সেজন্য আমি দুঃখিত; আমি শিকারে বেরিয়ে ছিলাম।

তবে ইনিই জগদ্বিখ্যাত প্র. না. বি।

আমি বলিলাম—না, না, কষ্ট আর কি? বাগানে ঘুরে দেখ্‌ছিলাম।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, এবারে দেখিলাম ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা মরা ভালুক পড়িয়া আছে। প্রঃ না. বি বলিলেন—এটাকে আজ শুয়া পাহাড়ের জঙ্গলে শিকার করলাম। ক'দিন থেকে জন্তুটা লোকের ক্ষেতখামারের উপর বড়ই উপদ্রব করছিল। শীতকালে ভালুকের উপদ্রব বড় হয় না, বসন্তকালে মহুয়া ধরতে আরম্ভ করলে এরা ছোটনাগপুরের দিক থেকে পালে পালে এসে উপস্থিত হয়। তখন দিনে তিন চারটে পর্যন্ত মেরেছি'।

আমি বলিলাম,—আপনাব যে শিকারের অভ্যাস আছে তা জানতাম না,।

তিনি হাসিয়া বলিলেন—গোড়ায় মানুষ শিকার ক'রে হাত পাকিয়েছি—এখন জন্তু শিকারে আর বেগ পেতে হয় না। নৈতিক বিচারে পশু বড় কিন্তু বুদ্ধিটা মানুষেব বেশি এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

আমার তখন প্র. না. বি-র শ্লেষ-তীক্ষ্ণ রচনার কথা মনে পড়িল।

প্র. না. বি বলিলেন চলুন যাই বাইরে গিয়ে রোদে বসা যাক্।

দু'জনে বাহির হইলাম। বাগানের মধ্য দিয়া দক্ষিণ দিকের ছোট

একটি কাঠের বাড়ীতে গিয়া পৌছিলাম। বাড়ীটা অদ্ভুত। কাঠের একটা স্তম্ভের উপর ঘরটি—যেদিকে খুশী ঘোরানো চলে। তিনি ঠেলা মারিয়া ঘুরাইয়া বাড়ীটাকে রৌদ্রমুখী করিলেন। তারপরে আমরা· দু'জনে বসিলাম।

খান কয়েক আরাম কেদারা ছিল।

প্র. না. বি বলিলেন—বাড়ীটার নাম রেখেছি সূর্যমুখী। যে দিকে সূর্য থাকে সে দিকে মুখ করে দি।

এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন—সে কি হাসি, সে কি শব্দ—যেন পাহাড়ের গা বাহিয়া তুষার স্তূপ ধসিয়া পড়িল—যেমন শব্দ, তেমনি শুভ্রতা!

আমি বলিলাম—আপনি বিখ্যাত লেখক কিন্তু সেই জন্যই যে শুধু দেখা করতে এসেছি তা নয়। আপনার নামের সঙ্গে আমার নামের আদ্যাক্ষর সাদৃশ্যে অনেকে আমাকে প্র. না বি মনে করে থাকবে। সেটা আমার পক্ষে গৌরবের হ'লেও—আপনার পক্ষে অপমানের, তাই ক্ষমা চাইতে এসেছি।

প্র. না. বি আবার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ক্ষমা চাইবেন কেন? তাহলে আমাকেও তো ক্ষমা চাইতে হয়। কারণ আপনার অনেক লেখার জন্য আমি অভিনন্দন পেয়েছি; বহু লোক আমাকে আপনি মনে করেন।

তারপরে বলিলেন—এ বড় মন্দ মজা নয়। আমরা দু'জনে ভিন্ন-লোক—অথচ বাঙালী পাঠক কিছুতেই তা স্বীকার করবে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এমন কেন হয়? তিনি বলিলেন—এটা মানসিক আলস্য ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙালী জাতের মধ্যে একটা শান্তি এসেছে, সমস্যা সমাধান করবার সহজতম পন্থা তারা এখন চায়। কোন

সমস্যাকে ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে সমাধান করবার ধীরতা তাদের নেই। অথচ অনেক সমস্যা আছে যার সমাধানের পক্ষে কিছুকাল ঝুলে থাকা আবশ্যক। যেমন ধরুন, গাছের ফল। তাকে সংগ্রহ করবার আগে দেখ্‌তে হয় ডালে ঝুলে থাক্‌বার কাল তার পূর্ণ হ'য়েছে কিনা।

ক্রমে বাংলা সাহিত্যের কথা উঠিয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —এখন রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি কাকে মনে করেন।

প্র. না. বি বলিলেন—আমার মতে নজরুল ইসলাম ও মোহিত মজুমদার—এঁরা দু'জনে এখন কবিশ্রেষ্ঠ।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—এঁদের দুজনের নাম আপনার এক সঙ্গে মনে হল?

—কেন হবে না? নজরুলের creative energy বেশি—কিন্তু শিল্প-জ্ঞান বড কাঁচা। মোহিতবাবুর creative energy কাজির চেয়ে কম, কিন্তু শিল্পচৈতন্য তার চেয়ে অনেক বেশি। যে-পরিমাণে তাঁর শিল্প-চেতনা আছে সে পরিমাণে Poetic energy থাক্‌লে তিনি great poet হ'তে পারতেন। কাজির শিল্পচেতনা ও Poetic energy সমমূল্য হ'লে তিনিও great poet হ'তে পারতেন।

আমি বলিলাম—আপনি নিজেকে কেন বাদ দিলেন?

প্র না. বি বলিলেন বাঙালী কবিদের মধ্যে আমাকে ধরলে বেচারাদের প্রতি অবিচার করা হয়। আমাকে পৃথিবীর মহা কবিদের সঙ্গে বিচার করবেন—হোমার, দান্তে, সেক্সপীয়র—প্রভৃতির আমি সগোত্র।

—এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আমি ভাবিলাম ঠিক প্র. না. বি-র মতই হইয়াছে বটে। লোকে এই সব কথা শুনিলে রসিকতা মাত্র ভাবিবে—কিন্তু তাহারা তো এই হাসি দেখিতে পাইল না!

তিনি বলিলেন—আমি জানি লোকে আমাকে অহঙ্কারী ভাবে কারণ আমি নিজের কথা সর্বদা বলি—কিন্তু ঠিক তার উল্টো; বিনয়ী লোকের স্বভাবই এই যে সে নিজের কথা বলে। অহঙ্কারী ব্যক্তিই অন্যের কথা আলোচনা করে। বিনয়ী জানে যে তার বুদ্ধি সামান্য—খুব বেশি হ'লে কেবল নিজের কথাই তার পক্ষে জানা সম্ভব। অন্যের মনের কথা সুদ্ধ জেনে ফেলেছি—এতখানি স্পর্ধা যার—তাকে অহঙ্কারী ছাড়া আর কি বল্‌বো?

এমন সময়ে ভৃত্য চা আনিয়া হাজির করিল।

প্র না. বি আমাকে চা ঢালিয়া দিলেন, কিন্তু দেখিলাম তিনি নিজের চায়ে চিনি নিলেন না। আমার মনেব ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—আপনি ভাব্‌ছেন আমি চায়ে চিনি খাইনে কেন? না, কোন বোগের জন্য নয়, পাছে মিষ্টি খেয়ে স্বভাব মধুর হ'য়ে ওঠে সেই ভয়ে চিনি খাওয়া ছেড়েছি।

বুঝিতে পারিলাম না তাঁহাব কথা সত্য না ঠাট্টা। প্র. না. বি-ব লেখা পড়িয়া পাঠকেরও ইহাই নিশ্চয় মনে হয়।

কথায় কথায় বাংলা নাটকের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল।

তিনি বলিলেন—গত ১০।১২ বছবের মধ্যে দু'খানি ভালো বাংলা নাটক বেরিয়েছে। রবিমৈত্রর মানময়ী গার্লস্‌ স্কুল আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েব দুই পুরুষ।

বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার কি ধারণা জিজ্ঞাসা কবিলাম।

তিনি বলিলেন—বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কিছুই নেই—অতীতও ছিল না। তারপরে বলিলেন—বাংলা নাটক সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছিল, কিন্তু সে সুযোগ বাঙালী লেখক নিতে পারেনি। বাংলা দেশের নিজস্ব বস্তু ছিল যাত্রা। বাঙালী যখন ইংরেজি শিখ্‌তে আরম্ভ করলো, তখন যদি সে বিদেশী আদর্শের নাটক ও রঙ্গমঞ্চ এদেশে

আমদানীর চেষ্টা না ক'রে যাত্রার শিল্পকে পরিবর্তন করে নিতে পারতো, তবেই প্রকৃত বাঙালীর নাট্যশিল্প গড়ে উঠতে পারতো। কিন্তু একথা তখন কারো মনে হয়নি। সাহিত্যিক সব শিল্পকলার মধ্যে নাটক-ই হচ্ছে সব চেয়ে একান্তভাবে স্বদেশী। ওর মধ্যে বৈদেশিক ভেজাল চলে না। বিদেশী এদিকের আদর্শে মেঘনাদ বধ কাব্যরচনা সম্ভব—কিন্তু নাটকে তা একেবারে অচল। যাত্রা—শিল্প উঁচুদরের নয়, কিন্তু সেক্সপীয়র সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে যে নাট্যকলা পেয়েছিলেন—তা যাত্রার চেয়ে উঁচুদরের ছিল না। নিজের প্রতিভায় তিনি তৎকালীন নাট্যশিল্পকে জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকলায় পরিবর্তন করে গিয়েছিলেন। এদেশে যে সেক্সপীয়র জন্মায় নি, তাতে বিস্মিত হচ্ছি না—কিন্তু সেক্সপীয়রের বাস্তবজ্ঞান যে কারো হয়নি—সেটাই বিস্ময়ের।

এখন আর যাত্রা শিল্পকে পরিবর্তন করা সম্ভব না। একে তো ও শিল্পটা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে—ওকে আর জীবিত বলা চলে না। সজীবেরই পরিবর্তন সম্ভব—মৃতের নয়। তারপরে আমরা ভ্রান্ত শিল্প আদর্শ অনুসরণ ক'রে এতদূর চলে এসেছি যে আর ফেরা সম্ভব বলে মনে হয় না। কাজেই বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ যে আছে এমন কথা বলি কি ক'রে?

অনেক বেলা হইয়াছে দেখিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম; বলিলাম—আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই পাইলাম।

প্র. না. বি হাসিয়া বলিলেন—আমিও কম আনন্দ পাইনি। এখানে লোকজন বড কেউ আসে না। আবার একদিন এলে খুশী হ'ব।

তাঁহার নিকটে বিদায় লইয়া আসিতে আসিতে ভাবিলাম—এই কথোপকথন লিখিয়া দেখিব—তাহা হইলে পাঠকদের প্র. না. বি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান হইবে—আর আমরা যে দুইজন লোক একথাও বুঝিতে পারিবে।

সত্য মিথ্যা কথা

স্থান :—কোনও রেডিও স্টেশনের ব্রডকাষ্টিং রুম।

সময় :—বেলা অনুমান আড়াইটা,—কিছু এদিক ওদিক হইতে পারে ; রেডিও বন্ধ ; মিষ্টার দাস, রেডিও অফিসার, ব্যস্ত ও বিরক্তভাবে পায়চারি করিতেছেন এবং বারংবার জানালা দিয়া বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন ; জানালা দিয়া বাড়ীর সদর দরজা—ও দরজার দুই দিকে পথের কিয়দংশ দেখা যায় ; মিঃ দাস ব্যগ্রভাবে সদর দরজার দুইপাশে লক্ষ্য করিতেছেন ; এক একবার দেয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাতেছেন—আবার ফিরিয়া জানালার কাছে যাইতেছেন।

তেওয়ারী নামে একজন হিন্দুস্থানী ভৃত্য ও রামচরণ নামে বাঙালী ভৃত্য ঘরের দরজাব কাছে মিঃ দাসের হুকুমের অপেক্ষায় সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান ; মিঃ দাসের ভাবগতিক দেখিয়া তাহারা কিঞ্চিৎ শঙ্কিত।

মিস্ বর্ধন একজন রেডিও-শিল্পী ; তিনি একপাশে একটি সোফার উপর বসিয়া আপন মনে তানপুরায় শব্দ করিতেছেন ; তানপুরা বাজান বলা চলে না, অবসরবিনোদন ও যন্ত্রটা পরীক্ষার ভাব হইতে তানপুরার তারে আঘাত করিতেছেন মাত্র ; এবং মাঝে মাঝে মিঃ দাসকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কৌতুক অনুভব করিতেছেন। মিঃ দাস ভৃত্যদ্বয়ের সম্মুখে আসিয়া থামিলেন।

মিঃ দাস—তেওয়ারী, তোমারা বাঁশকো লাঠি হ্যায় ?

তেওয়ারী—ক্যা হুজুর ?

মিঃ দাস—সমঝা নেই ! বাঁশকো লাঠি।

তেওয়ারী—বাঁশী ? জিস্‌কো বংশী বোলতা ? জরুর হ্যায় হুজুর !

"যমুনাকি তীরে নীরে বংশী বাজাওয়ে
মিঠি তান শুনাওএ"

সুরু করিয়া এই দুই ছত্র গাহিল

মিঃ দাস—[রাগিয়া গিয়া] তোমারা শির্—

তেওয়ারী—শির তো নেহি হ্যায় হুজুর—

মিঃ দাস—[বিস্ময়ে] ওরে রামচরণ, ও বলে কি ?

রামচরণ—ঠিকই বলেছে বাবু। আমাকেও একদিন ঐ কথা বলেছিল, শেষে অনেক জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ওর বুদ্ধিশুদ্ধি নেই বলে দেশের লোক ওকে বাংলা দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে ; বলেছে তোর যে রকম বুদ্ধি তাতে বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও রুটী মিল্‌বে না।

তেওয়ারী—এ ঠিক বাত হ্যায় হুজুর—

মিঃ দাস—এ কি রকম হ'ল ? আমি যখন হিন্দিতে বললাম—তুমি বুঝতে পারলে না,—আর বাংলা দিব্যি বুঝ্‌লে ?

তেওয়ারী—হিন্দি। হিন্দি কোন্ বোলা থা ?

মিঃ দাস—কেন আমি ?

তেওয়ারী—উস্‌কো কভি হিন্দি নেহি কহা যাতা। হুজুর, কসুর মাপ কিজিয়ে—আপকো হিন্দিসে বাংলা বুলি হাম বহুৎ সমঝাতা !

মিঃ দাস—বাই জোভ ! মিস্ বর্ধন, কাগজ আছে ?

মিস্ বর্ধন—কেন ?

মিঃ দাস—হিন্দুস্থানীরা হিন্দি বুঝতে পারে না—। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার পক্ষে এটা মস্ত আর্গুমেণ্ট !

মিস্ বর্ধন—ও বলছিল, আপনার হিন্দি হিন্দিই নয়—

মিঃ দাস—[বিরক্ত হইয়া] নয় তো নয়। এই রামচরণ, তুই আর তেওয়ারী গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, আমি যেই এই জানালার কাছে থেকে ইসারা করবো—অমনি বুঝলি ?

রামচরণ—আজ্ঞে বুঝেছি, কি করতে হবে ?

মিঃ দাস—যে আসবে তাকে ঝাপটে ধরবি—এই এমনি করে !

তেওয়ারী—এসা মাফিক্ ? লেকেন হুজুর, কই আওরাৎ আয়েগা ?

মিঃ দাস—যে আসুক ! তারপরে তাকে টান্‌তে টান্‌তে এখানে নিয়ে আসবি। বুঝলি ?

রামচরণ—আজ্ঞে, হঁ্যা।

মিঃ দাস—যা তবে, এখন সদর-দরজার কাছে গিয়ে লুকিয়ে থাক। যাও তেওয়ারী—

তেওয়ারী—জো হুকুম।

উভয়ের প্রস্থান

মিস্ বর্ধন—মিঃ দাস, কাকে ধরতে বললেন ? চোর-ছ্যাঁচড় নাকি ?

মিঃ দাস—চোর হ'লে তো ছিল ভাল—

মিস্ বর্ধন—তবে কি ?

মিঃ দাস—রোজ রোজ—সদর-দরজার কাছে ! আজ একবার দেখব—

মিস্ বর্ধন—ব্যাপারটা কি ?

মিঃ দাস—আপনারা শিল্পী মানুষ, সব দেখেও দেখেন না ! সদর দরজার কাছে প্রত্যেক দিন কে যেন আবর্জনা ফেলে যায়—

মিস্ বর্ধন—তাতে কি হ'য়েছে ?

মিঃ দাস—কি হ'য়েছে ? কি বল্‌ছেন মিস্ বর্ধন ! অন্যের বাড়ীর আবর্জনা—আমাদের বাড়ীর সম্মুখে এনে ফেলে যাবে !

মিস্ বর্ধন—অবাক করলেন মিঃ দাস ! চিরদিন তো এই রীতিই

চলছে! আমার বাড়ীর আবর্জনা আপনার বাড়ীর সম্মুখে ফেলবো—; আপনার বাড়ীর আবর্জনা পড়বে রামের বাড়ীর সম্মুখে; রামের বাড়ীর পড়বে—শ্যামের বাড়ীর সম্মুখে;—এমনি করে আবর্জনার ধারা শহরের অন্য প্রান্তে গিয়ে শেষে ধাপার মাঠে পৌছবে।

মিঃ দাস—কিন্তু কি অবিচার বলুন তো—

মিস্ বর্ধন—অবিচার আপনি করছেন! বাঙালীর জীবনে আর কি সুখ আছে? পরের বাড়ীর সম্মুখে আবর্জনা ফেলবার শেষ সুখটিও আপনি যদি হরণ করেন, তবে বাঙালী বাঁচবে কোন্ সুখে?

মিঃ দাস—বাঙালী! বাঙালী। [হঠাৎ ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করিয়া] দাঁড়ান সময় হ'য়েছে, আমি জানলার কাছে যাই।

মিস্ বর্ধন - কি অসীম ধৈর্য আপনার। এই জন্যে সেই বেলা একটা থেকে এখানে বসে আছেন?

মিঃ দাস—চুপ করুন, সময় হয়েছে। ওই যে তেওয়ারী আর রামচরণ। বেশ—এইবার।

এমন সময়ে দেখা গেল—পাশের বাড়ীর ঝি অতি সন্তর্পণে সাবধানে এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে এক টিন আবর্জ্জনা—এটো পাতা প্রভৃতি লইয়া আসিয়া সদর দরজার পাশে ঢালিয়া দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, মিঃ দাস চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

মিঃ দাস—[উৎসাহে হিন্দি বাংলা ইংরাজি মিশাইয়া] তেওয়ারী, রামচরণ, পাকড়ো,—ভাগ যাতা। জোরসে পাকড়ো। বহুৎ কিয়া! বহুৎ আচ্ছা। একদম হিঁয়াপর লে আও। I shall see the culprit!

তেওয়ারী—[বাহির হইতে] হুজুর, আওরৎ হ্যায়—

মিঃ দাস—হ্যায় তো হ্যায়—! আগাড়ি লে আও—

এমন সময়ে রামচরণ ও তেওয়ারী সেই ঝিকে টানিতে টানিতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল

রামচরণ—এই যে বাবু ধ'রে নিয়ে এসেছি—

তেওয়ারী—হুজুর, একঠো কুর্সি দেগা ?

মিঃ দাস—কুর্সি ! কিসকো দেগা ?

তেওয়ারী—আওরৎ হ্যায় ! উস্‌কো লিয়ে—

মিঃ দাস—চুপ থাকো—[ঝির প্রতি] বাপু, তোমাকে যদি থানায় দি !

ঝি—আমিও তাই চাই—

মিঃ দাস—তাই চাও ? কেন ?

ঝি—আপনিই বলুন, কেন থানায় দিতে চান ?

মিঃ দাস—তোমার জেল হবে—

ঝি—আমি তো জেলে যেতেই চাই—

মিঃ দাস—জেলে যেতেই চাও ? কেন ?

ঝি—তা হলে আর চাকবি করতে হবে না—

মিঃ দাস—চাকরি না করলে রোজ রোজ বাড়ীর সম্মুখে আবর্জনা ফেলবে কে ?

ঝি—সে জন্য ঝিয়ের অভাব হবে না—

মিস্ বর্ধন—দেখ বাছা, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে—তুমি লেখাপড়া শিখেছিলে ?

ঝি—শিখেছিলাম বই কি ?

মিস্ বর্ধন—কতদূর ?

ঝি—কলেজে ঢুকে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

মিস্ বর্ধন—ছাড়লে কেন ?

ঝি—আজ্ঞে, সহশিক্ষার দুঃসহ ধাক্কা সামলাতে পারব না ভেবে।

মিঃ দাস—এতো পড়াশোনা আছে—আর এটুকু জানো না যে পরের বাড়ীর সম্মুখে আবর্জনা ফেলতে নেই ?

ঝি—কেমন করে জানবো ?—ইস্কুলে এ সব কথা তো কেউ শেখায় নি।

মিঃ দাস—তবে কি শিখেছ ?

ঝি—যা চিরদিন দেখছি! পরের বাড়ীতে নিজের বাড়ীর উনুনের ধোঁয়া কৌশলে চালিয়ে দিতে হবে, পরের বাড়ীর সম্মুখে আবর্জনা ফেলতে হবে—

মিঃ দাস—অসহ্য !

ঝি—আজ্ঞে—আপনারাও ফেলতে আরম্ভ করেন। বেশ সহ্য হবে!

মিঃ দাস—বাজে কথা! কোন্ বাড়ীর ঝি তুমি ?

ঝি—আজ্ঞে, পাশের বাড়ীর—

মিঃ দাস—কার বাড়ী ?

ঝি—ডাক্তারবাবুর—

মিঃ দাস—ডাক্তারের বাড়ীর ঝি হ'য়ে তুমি এমন অস্বাস্থ্যকর কাজ কর ?

মিস বর্ধন—ওকে মিছে ধমকাচ্ছেন—ওতো আর ডাক্তার নয়—

ঝি—কে বললে আমি ডাক্তার নই ? আমিই ডাক্তার।

ঘরশুদ্ধ সকলে অবাক

মিঃ দাস—কি বলছ ?

ঝি—বিশ্বাস না হয় এই দেখুন, এই শাড়ীর নীচে কোট পাণ্টলুন আছে।

সকলে (সমস্বরে)—কি আশ্চর্য !

ঝি—আশ্চর্যটা কি ? মা লক্ষ্মী, মিঃ দাস, এই দেখুন আমার শাড়ীখানা খুলে ফেলে দিলাম—এইবার দেখুন আমি ডাক্তার কিনা ? এই দেখুন সুট, এই দেখুন স্টেথোস্কোপ; এতেও বিশ্বাস না হয় প্রেস্কৃপশান্ লিখে দিচ্ছি, ওষুধ খান, দু'দিনের মধ্যে কম্ম নিকেশ হয়ে যাবে।

তেওয়ারী—আওরৎ নেহি হ্যায়— ! মুলুক তো মুলুক, বাংলা মুলুক !

মিঃ দাস—এই রামচরণ, তোরা এবার যা। ওয়েল ডক্‌টর—

ডাক্তার—ডাক্তার সেন—

মিঃ দাস—ডাক্তার সেন—ব্যাপারটা কি হ'ল বুঝতে পারছি না, আপনি ডাক্তার, ঝি সেজে এই বাড়ীর সদর-দরজায় আবর্জনা ফেলে যান কেন ?

ডাক্তার—ডিভিসন্ অব লেবার—

মিঃ দাস—কি রকম ?

ডাক্তার—আপনারা অসুখে ভুগবেন, আমি ওষুধ দেবো—

মিঃ দাস—তার জন্যে আবর্জনা ফেলা কেন ?

ডাক্তার—নইলে অসুখ হবে কি করে ? ব্যাপারটা বুঝুন—যতদিন সুস্থ আছেন, আপনাদের ওষুধের দরকার নেই। আর ব্যাধি তো আমার সুবিধামত আপনাকে আক্রমণ করবে না, কাজেই আমাকে ব্যাধির ঘটকালি করতে হয়।

মিঃ দাস—সেইজন্য নিজে এসে আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন ?

ডাক্তার—একেই তো ইংরেজিতে বলে, নিজের field create করে নেওয়া। আমিই অসুখ বাধিয়ে দেবো, আবার আমিই সারাবো, মাঝ থেকে পয়সা আসবে আমার—

মিঃ দাস—আর যদি অসুখ না সারাতে পারেন।

ডাক্তার—তবে আপনি মরবেন, কিন্তু পয়সাটা দিয়েই মরবেন—

মিঃ দাস—কিন্তু ঝি সেজে এ-কাজ কেন করেন ?

ডাক্তার—মা লক্ষ্মী যদি কিছু মনে না করেন তো বলি ; পরের বাড়ীর সম্মুখে আবর্জনা ফেলার ব্যবসাটা মাতৃজাতির একচেটিয়া, সেইজন্য ঝিয়ের পোষাক নিতে হয়—

মিঃ দাস—তবু ভাল যে এই কাজ আপনি একাই করে থাকেন।

ডাক্তার—কে বললে আমি একা ?

মিঃ দাস—তবে ?

ডাক্তার—যে সব ঝি পরের বাড়ীর সম্মুখে বেলা তিনটার সময় আবর্জনা ফেলে, তারা প্রত্যেকে আমার মত ছদ্মবেশী ডাক্তার—

মিঃ দাস—কি বলছেন ?

ডাক্তার—বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখবেন, কোন ডাক্তারকে বেলা তিনটার সময় ডিস্‌পেন্‌সারিতে পাবেন না। বাড়ীতে গেলে শুন্‌তে পাবেন্ ডাক্তারবাবু ঘুমোচ্ছেন। ঘুমোচ্ছেন না ছাই, তিনি তখন ঝিয়ের সাজ খুলছেন।

মিস্ বর্ধন—তবে কি ডাক্তারদের কাজ ব্যাধি নিবারণ নয় ?

ডাক্তার—সেটা তো পরে ; আগে তাদের কাজ ব্যাধি প্রচার। প্রবৃত্তি থাক্‌লে তো তার নিবৃত্তি সম্ভব, কি বলেন ?

মিঃ দাস—নাঃ, দেশের আর কোন আশা নেই।

ডাক্তার—আর ডাক্তারদেরই বা কোন্ আশা আছে ? আমরা ছ'বছর ধরে টাকা পয়সা খরচ করে ডাক্তারি শিখেছি ; তারপর থেকে কোট-প্যাণ্টলুন, ষ্টেথোস্কোপ, ছুরি, ওষুধ প্রভৃতির নখদন্ত ও বিষ নিয়ে ওৎ পেতে বসে আছি, রুগী নেই। এমন কিছু দিন চললে, সব যে মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। সুপ্ত সিংহের মুখে তো শিকার প্রবেশ করে না, তাই একটু উদ্যম করে রোগ প্রচার করতে হয় ; রুগীর জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছি, দিনের পর দিন, রুগীর দেখা নেই ; এ বিরহ সহ্য করতে না পেরে এই দুঃসাহসিক অভিসার করতে বাধ্য হয়েছি।

মিঃ দাস—কি ভয়ানক কথা ! কোন জাদুমন্ত্রে দেশ থেকে যদি রোগ নির্মূল করে ফেলা যায়, তাতে আপনাদের আপত্তি হবে দেখছি—

ডাক্তার—নিশ্চয়ই হবে—একশবার হবে।

মিঃ দাস—নাঃ, দেশের আর আশা নেই দেখছি। বাঙালী, তোমার মৃত্যুবাণ তুমি নিজেই নির্মাণ করছ। আসল কথা কি জানেন, বাঙালী এখনও শহরে বাস করবার যোগ্য হয় নি—মূলত সে একটা গ্রাম্য জাতি। তাই নিজের বাড়ীর আবর্জনা পরের বাড়ীর দরজায়, উনুনের ধোঁয়া পরের বাড়ীর জানালায় সে অনায়াসে চালিয়ে দেয়; ট্রাম বাস যেন তার বৈঠকখানা, দশজনের অস্তিত্বকে উপেক্ষা ক'রে উচ্চস্বরে পারিবারিক আলোচনা চালাতে সঙ্কোচ বোধ করে না। এ জাতের শহরে এসে বাস করা উচিত নয়, গ্রামে ফিরে যাওয়াই সঙ্গত।

[পুলিনবাবু ও গিরিজাবাবুর ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ, এরা দুইজনও রেডিও অফিসের লোক]

পুলিনবাবু ও গিরিজাবাবু—কি সর্বনাশ।

মিঃ দাস—কি হ'য়েছে পুলিনবাবু, কি ব্যাপার গিরিজাবাবু, ছুটতে ছুটতে আসছেন যে, হাঁপাচ্ছেন কেন? কোন বিপদ ঘ'টেছে নাকি?

পুলিনবাবু—কি সর্বনাশ!

মিঃ দাস—সর্বনাশটা কি?

পুলিনবাবু—এ আরম্ভ করেছেন কি?—আপনি এ সব কি ব্রডকাস্ট করছেন?

মিঃ দাস—ব্রডকাস্ট কি করলাম?

গিরিজাবাবু—পুলিনবাবু, যা ভেবেছি। মাইক্রোফোন 'অন' করা রয়েছে।

গিরিজাবাবু, পুলিনবাবু ও মিঃ দাস—কি সর্বনাশ।

মিঃ দাস—বন্ধ করো, বন্ধ করো। পুলিনবাবু বন্ধ করুন।

সকলে দৌড়াইয়া গিয়া মাইক্রোফোন 'অফ্' করিয়া দিল

পুলিনবাবু—এই যে বন্ধ করে দিলাম—

মিঃ দাস—যাক, বিপদ কেটে গেল।

পুলিনবাবু—বিপদ কাটে নি মিঃ দাস। বিপদ জনতার আকার ধরে ছুটে আসছে।

মিঃ দাস—সে আবার কি?

পুলিনবাবু—বলুন না গিরিজাবাবু, ব্যাপার কি। আমি আর পারছি না—

গিরিজাবাবু—শুনুন তবে মিঃ দাস—আমরা দুজনে ট্রামে করে শ্যামবাজার থেকে এখানে আসছিলাম। হঠাৎ রেডিওর শব্দ কানে গেল। ভাবলাম এ কি? এখন তো কোন প্রোগ্রাম নেই। রেডিও চলে কেন? কান পেতে রইলাম। কি সর্বনাশ! বুঝলুম আপনার কণ্ঠস্বর। আর নাঃ, আর পারছি না, এবার আপনি বলুন পুলিনবাবু—

পুলিনবাবু—আর কি বলবো? শুনলাম আপনি বাঙালীকে অনর্গল অপমান করে যাচ্ছেন!

মিঃ দাস—অপমান করলাম কোথায়?

পুলিনবাবু—অপমান ছাড়া আর কি? পরের বাড়ীর সম্মুখে আবর্জনা ফেলার বিরুদ্ধে, পরের বাড়ীতে উনুনের ধোঁয়া চালিয়ে দেবার বিরুদ্ধে বলছেন—একে অপমান ছাড়া আর কি বলে?

মিঃ দাস—ভালই হ'য়েছে। যে কথা আমি শুধু একজনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম, তা সমস্ত শহরের লোক শুনেছে।

পুলিনবাবু—মিঃ দাস, আপনার মাথা কি খারাপ হয়েছিল? এসব কথা বলা উচিত, কারণ এসব কথা ভাল, কিন্তু আপনি মাইক্রোফোন 'অন' করে দিয়ে এসব কথা বলতে গেলেন কেন?

মিঃ দাস—মাইক্রোফোন তো বন্ধই ছিল হঠাৎ তা 'অন্' করে দিল কে?

ডাক্তার—মাইক্রোফোন 'অন্' করে দিয়েছি আমি, আমি ডাক্তার—

মিঃ দাস—কেন 'অন্' করতে গেলেন?

ডাক্তার—যে কথা আপনি আমাকে ঘরে ধরে এনে শোনাচ্ছিলেন, কৌশলে আমি তা শহরের লোকের কানে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি। তারাই বিচার করবে, আমাদের মধ্যে কে অন্যায় করেছে? আমি আবর্জনা ফেলে, না আপনি আবর্জনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে—

মিঃ দাস—এ বিষয়ে কি দ্বিমত হতে পারে?

পুলিনবাবু—না, দ্বিমত হবার কোন আশঙ্কা নেই। টালা থেকে টালিগঞ্জ অবধি সব লোক ছুটে এলো বলে।

মিঃ দাস—কেন?

ডাক্তার—কেন?—আপনি তাদের অপমান করেছেন, তাদের জন্মগত অধিকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য করছেন, আর তারা চুপ করে থাকবে? বাঙালীর আত্মসম্মানজ্ঞান সুবিধা বুঝে জেগে ওঠে।

পুনিলবাবু—মিঃ দাস, ওই শুনুন ক্রুদ্ধ জনতার গর্জন।

মিঃ দাস—ও পুলিনবাবু, কি হবে?

ডাক্তার—হবে আবার কি? আপনাকে ক্রুদ্ধ জনতা এখনি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

মিঃ দাস—ডাক্তারবাবু, সে কাজের জন্য তো আপনি একাই যথেষ্ট! জনতার কি দরকার? আচ্ছা পুলিনবাবু, জনতাকে স্মরণ করিয়ে দিলে হয় না যে তারা অহিংসা-মন্ত্র গ্রহণ করেছে—

পুলিনবাবু—মিঃ দাস, বাঙালী বিদেশীর বেলাতে অহিংস, স্বদেশীর বেলাতে নয়।

মিঃ দাস—তবে?

পুলিনবাবু—আচ্ছা, আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। আপনারা সকলে চুপ করুন।

মিঃ দাস—পুলিনবাবু, ওই শুনুন জনতার গর্জন ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে।

পুলিনবাবু—আঃ, চুপ করুন!

মিঃ দাস—ওকি পুলিনবাবু, আপনি আবার মাইক্রোফোন 'অন্' করে দিচ্ছেন কেন?

পুলিনবাবু—[চাপা গলায়] আঃ, চুপ করুন! আমি এখন কিছু ব্রডকাস্ট করবো।

[তারপরে তিনি গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বক্তৃতার সুরে আরম্ভ করিলেন]

হে ভারতের বৃহত্তম নগরের মহত্তম অধিবাসিবৃন্দ! আপনাদের কাছে আমরা মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। আমাদের অনবধানতাবশতঃ একটা উন্মাদ লোক অফিসে আসিয়া যা খুসি তাই বলিয়া বাঙালীজাতিকে অপমান করিয়া গিয়াছে; তাহাকে আমরা ধরিয়া স্বস্থানে প্রেরণ করিলাম। সে যাহা বলিয়াছিল, আশা করি তাহা আপনারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; আর কানে প্রবেশ করিয়াছিল সত্য, এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাহা অপর কান দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে; দেখুন দুইটি কান থাকিবার কত সুবিধা! কিন্তু এত বড় একটা জাতির মধ্যে দুই চারি জন এক-কান-কাটা লোক থাকিলেও থাকিতে পারে; এসব কথা হয়তো তাহাদের মস্তিষ্ক হইতে প্রস্থানের পথ পায় নাই বলিয়া মাথার মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। তাহাদের সুবিধার জন্য আমরা প্রচার করিতেছি।

—হে মহান জাতি, তোমরা নিজের বাড়ীর আবর্জনা সবদাই পরের বাড়ীর দরজায় ফেলিবে; তোমরা নিজের উনুনের ধোঁয়া পরের বাড়ীতে চালনা করিয়া দিবে; ট্রাম ও বাসকে নিজের বৈঠকখানা মনে করিয়া তারস্বরে পারিবারিক আলোচনা চালাইবে; পাশের আসনে উপবিষ্ট নিরীহ যাত্রীর নাকে তোমার বিড়ির ধোঁয়া

প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে ; রেলের টিকিট করিবার সময় দৈব-প্রেরণায় গুঁতাগুঁতি করিয়া হাত পা ভাঙিবে, আর সিনেমার টিকিট করিবার সময় জনতার চাপে প্রাণদান করিয়া সিনেমা-শহিদ সাজিবে। নিতান্ত নিন্দুকেরাই বলে বাঙালী নাগরিক হইয়া উঠিয়া গ্রামকে ভুলিয়া গিয়াছে ; বাঙালী এখনো মনে মনে গ্রাম্য, ইহাই বাঙালীর 'ব্যাক টু ভিলেজ' !

মিঃ দাস—একি পুলিনবাবু, মাইক্রোফোন 'অফ্' করে দিলেন যে ?

পুলিনবাবু—আমার কাজ শেষ হয়ে গেল !

মিঃ দাস—এ যে ভয়ানক গালাগালি দিলেন !

পুলিনবাবু—কোথায় গালাগালি ! ওই শুনুন, জনতা কেমন আনন্দধ্বনি করছে ! খুসি না হলে তারা কি আনন্দধ্বনি প্রকাশ করতো ?

মিঃ দাস—সব উলটপালট হয়ে গেল ! ডাক্তারবাবু, আপনারই জিত হল ; এবার থেকে নিয়মিত ভাবে আবর্জনা ফেলবেন। প্রতিবাদ করবার সাহস আর নেই।

পুলিনবাবু—যাক মিঃ দাস, এবারের মতো ফাঁড়া আপনার কেটে গেল।

মিঃ দাস—তা গেল বটে। আমি আজই এ চাকরিতে ইস্তাফা দেবো—

পুলিনবাবু—বেশ !

মিঃ দাস—শুধু তাই নয়, কলকাতা ছাড়বো—

পুলিনবাবু—বেশ !

মিঃ দাস—এবং ডাক্তার দিয়ে নিজেকে একবার পরীক্ষা করাবো—

পুলিনবাবু—সেই সঙ্গে মাথাটাও পরীক্ষা করাবেন।

ডাক্তার—আমার সার্টিফিকেট চলবে কিনা জানি না, কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারি—

মিঃ দাস—আমি পাগল—

ডাক্তার—না, আপনিই একমাত্র প্রকৃতিস্থ। আর আমরা সমস্ত জাতটা পাগল।

পুলিনবাবু—বেশ!

ডাক্তার—কিন্তু মিঃ দাস, লোকে আপনাকেই পাগল বলবে, কারণ আপনি hopeless minorityতে—

পুলিনবাবু—মিঃ দাস, আপনি পাগল কিনা জানি না, কিন্তু এটা নিশ্চয় জানি আপনি নির্বোধ—

মিঃ দাস—বোধ হয় দুটোই—

মিঃ দাস ছাড়া সকলে—ওদুটো প্রায়লোকে প্রায় একসঙ্গেই হয়ে থাকে।

নূতন বজ্র

দেবরাজ ইন্দ্র কৈলাস-শিখরে মহাদেবের নিকটে গিয়া বলিলেন—দেবাদিদেব, সম্প্রতি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি।

মহাদেব শুধাইলেন—কি হইয়াছে বৎস?

ইন্দ্র বলিলেন—পুনরায় দৈত্যরা স্বর্গ কাড়িয়া লইয়া আমাদের তাড়াইয়া দিয়াছে।

মহাদেব বলিলেন—দধীচির হাড়ে গড়া সেই বজ্রখানা আছে না?

ইন্দ্র বলিলেন—আছে। তাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম কিন্তু ফল হইল না।

তার পরে একটু থামিয়া বলিলেন—'এ সব দৈত্য নহে তেমন।'

মহাদেব কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—বৎস, ঠিক হইয়াছে।

ইন্দ্র বলিলেন—হইবেই তো।—এই বলিয়া ইন্দ্রের সভাকবি বৃহস্পতি যে সংস্কৃত শ্লোকটা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন তাহা আবৃত্তি করিলেন।

মহাদেব বলিলেন—যদিও উহার অর্থবোধ হইল না, তবু আশা করি উহা আমার প্রশংসা ছাড়া আর কিছু নয়।

ইন্দ্র বলিলেন—আপনি যথার্থ বুঝিয়াছেন।

মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—তবে শোন বৎস, বঙ্গদেশের রাজধানীতে যাও। সেখানকার সবচেয়ে বড় ময়দার গুদামের পাশে সবচেয়ে বড় সংবাদ পত্রের অফিস। সেই অফিসে ঢুকিয়া সম্পাদককে দেখিতে পাইবে, তাহাকে দেবতাদের উপকারের জন্য নিজের অস্থি দান

করিতে বল। সেই অস্থি দিয়া বজ্র গড়িয়া নিক্ষেপ কর—জগতে এমন দৈত্য নাই, যাহারা সে অস্ত্রের আঘাত সহ্য কবিতে পারে।

ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন—সম্পাদক তো সামান্য মানুষ!

মহাদেব ইন্দ্রের অজ্ঞতায় হাসিয়া বলিলেন—বৎস, সম্পাদক সামান্য মানুষ নয়! যাও, দেখিলে বুঝিতে পারিবে।

ইন্দ্র মহাদেবকে প্রণাম করিয়া রঙ্গদেশের রাজধানীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

[২]

মহাদেব কিছু কম করিয়া বলিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রের অফিসেব একদিকে ময়দার গুদাম, একদিকে বৃহৎ গোশালা, একদিকে কশাইখানা, আর একদিকে জেলখানা—মাঝখানে সেই অফিস।

দরজায় শুণ্ডহীন গণেশেরমত দুই ভোজপুরী দারোয়ান বসিয়া বাম করতলে খৈনি টিপিতেছে; ইতস্ততঃ কৃশকায় বিরলভূষণ কালিঝুলি মাখা কম্পোজিটারের দল ঘুরিতেছে—যেন মহাদেবের সব অনুচর; ভিতরে কয়েকটা মুদ্রাযন্ত্র ভীষণ আর্তনাদে রত,—যেন লৌহদানব। দোতালাব সিঁড়িটা এতই খাড়া যেন স্বর্গের দিকে উঠিয়াছে;—যাহোক—ইন্দ্রের স্বর্গে ওঠা অভ্যাস ছিল বলিয়াই তাহা দিয়া কোনমতে উঠিয়া সম্পাদকের খাস কামরায় গিয়া পৌছিলেন। সহকারীগণ পরিবৃত সম্পাদককে দেখিয়া তাঁহার নয়ন সার্থক হইল। সম্পাদকের টাকের উপরে ঘন ঘন বিশ্বচক্র আবর্তিত হইতেছে—ইহা দেখিয়া সত্যই তাঁহার মনে হইল যে ইনি সামান্য মানুষ নহেন। কিন্তু উপরে চাহিতেই দেখিলেন বিশ্বচক্র নয়, বিদ্যুতের পাখা ঘুরিতেছে, তারই ছায়া সম্পাদকীয় মসৃণোজ্জ্বল টাকে প্রতিফলিত হইতেছে। সম্পাদক তাঁহার দিকে দৃকপাত মাত্র না করিয়া

খানিকটা 'খৈনি' মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন ; তার পরে এক টিপ নস্য লইয়া নাকে পুরিলেন, একপাত্র কি যেন তরল সুগন্ধি পান করিলেন, অবশেষে একটা সিগারেট ধরাইলেন—এই রূপে নেশা চতুষ্টয় চর্চা সমাধা করিয়া ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—গদ্য না পদ্য ?

ইন্দ্র বুঝিলেন স্তোত্রপাঠের কথা হইতেছে। তিনি সম্পাদক-বন্দনা পদ্যে লিখাইয়া আনিয়া ছিলেন, তিনি পদ্যে সম্পাদক বন্দনা পাঠ কারলেন।

সম্পাদক খুসি হইয়া বলিলেন—বাঃ, বেশ তোমার হাত।—হাসিবার সময়ে সোনায় বাঁধা দুটি দাঁত ঝলক মারিয়া উঠিল।

শুধাইলেন—কেন আসিয়াছ ?

ইন্দ্র বলিলেন—মহাদেব আমাকে পাঠাইয়াছেন।

সম্পাদক আশাভঙ্গের সুরে বলিলেন—ওঃ মহাদেব।—আমি ভাবিয়াছিলাম বুঝি লাটসাহেব।

সহকারীর দল তালে তালে মাথা নাড়িয়া উঠিল।

সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন—দবকারটা কি ?

ইন্দ্র বলিলেন—আব কিছুই নয়, স্বর্গ উদ্ধারেব জন্য আপনার প্রাণ দিতে হইবে।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি বলিলেন—মাত্র এই ? তবু ভাল, আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি চাঁদা আদায় করিতে আসিয়াছ।

বড সহকারী বলিলেন—আমাদের দাদা প্রাণ দিতে কৃপণ নহেন।

মেজো সহকারী বলিলেন—কবি তো ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলেন—

যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি
ফেলিব সবারে গালিতে পাড়ি

যত দেশ আছে বিকাতে পারি,
যত ছেলে আছে বকাতে পারি,
দেশের জন্য ঠকাতে পারি
ক্রমে হবে মোর ওজন ভারি
তবে আর কি বা চাই
পরাণের সাধ তাই।

সম্পাদক লজ্জায়, স্নেহে গলিয়া বলিলেন—কি ছাই বলিস্—যাঃ, আজ থেকে তোর পাঁচসিকে মাইনে বেড়ে গেল।

অতঃপর সেজো সহকারী আরম্ভ কবিল—জানেন মশাই, দাদা কতবার প্রাণ দিয়াছেন—একবার যুধিষ্ঠির পার্কে, একবার ভীমসেন পার্কে, একবার রঘুপতি পার্কে, একবার যাজ্ঞসেনী পার্কে, কত আর বলি? প্রাণ দিতেই আছেন।

ছোট সহকারী বলিল—দেখুন না, দাদার জ্ঞান আর গর্দান কেমন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সম্পাদক বলিলেন—আঃ, তোরা থাম না। নিজের প্রশংসা আর শুনিতে পারি না।—এই বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন—

আপনি আত্মত্যাগের কথা বলিতেছেন, আমার আর আছে কি? কিছু টাকা, খান কয়েক বাড়ী, দু'খানা গাড়ী, আর কয়েক মণ মাংস—এ ছাড়া আব আমার আর কি আছে?—এমন কি বিবাদ পর্যন্ত করিবাব অবসর পাই নাই। দেশের জন্য, বিশ্বের জন্য এখানে স্থাণুবৎ বসিযা টাকের পেরিস্কোপে চরাচরের প্রতিবিম্ব ফেলিয়া নিরীক্ষণ করিতেছি—

মেজো বলিল—দাদা আমাদের জ্ঞান সমুদ্রের সাবমেরিন।

সেজো বলিল—প্রতিদিনের দৈনিক কাগজ এক একটি টর্পেডো—

তার ঘায়ে যে কত মিলন, কত প্রণয়, কত মস্তিষ্ক, কত সভা ভাঙিতেছে তার ইয়ত্তা নাই।

সম্পাদক বলিলেন—স্বার্থত্যাগের কথাই যদি উঠিল—তবে বলি, আমার মত স্বার্থত্যাগী কয় জন আছে? আমি দেশের জন্য প্রতিদিন এক গণ্ডা মুরগী, ছ'ডজন ডিম, আড়াইটা খাসি, এক হন্দর রুটি, একশত পান্তুয়া, অর্ধমণ দই, চার বোতল 'হোআইট হর্স' খাইয়া থাকি। ডাক্তারে বলে—শেষে যে সন্ন্যাস রোগে মারা যাবেন। আমি বলি—ডাক্তার, সন্ন্যাসী সন্ন্যাস রোগে ছাড়া আর কিসে মারা যাবে? আমি যে ইকনমিক সন্ন্যাসী, এতে আমার ক্ষতি কত দেখুন; আগে লাগিত ৫নং জুতা—এখন লাগে ১৩নং জুতা। কত বেশি দাম দিতে হয়! আগে জামা তৈরি করিতে লাগিত ৫ গজ কাপড়—এখন লাগে ১॥ থান—আবার দেখুন, কত বেশি দাম দিতে হয়।

আরও দেখুন, দেশের জন্য সত্য মিথ্যার ভেদ ঘুচাইয়া দিয়াছি; ভালমন্দর দ্বন্দ্ব কাটিয়া গিয়াছে। আত্মপর বোধ নাই; শত্রুমিত্র জ্ঞান নাই—এমন কি, মানুষকে আর মানুষ বলিয়া মনে হয় না। আর্টের জন্যই যেমন আর্ট—আমি তেমনি দেশের জন্যই দ্বেষের সাধনা করিতেছি। স্বার্থত্যাগ আবার কাহাকে বলে?

তার পরে দেখুন, দেশের জন্য আমার কলম সিঁধকাঠি হইয়া উঠিয়াছে—ইহা যদি স্বার্থত্যাগ না হয় তবে স্বার্থত্যাগ কি? বুড়া দধীচি এমন আর কি করিয়াছিল? জীর্ণ অস্থি কয়খানা দেওয়াতে এমন আর কি মাহাত্ম্য! আমি মরিলে না হয় আমার অস্থি কয়খানা লইয়া যাইবেন।

ইন্দ্র বলিলেন—কিন্তু আমরা যে আর অপেক্ষা করিতে পারি না।

সহকারীরা কোরাসে বলিয়া উঠিল—দাদার যে এত মাহাত্ম্য

জানিতাম না। দধীচির হাড়ের 'চেয়েও তাঁহার হাড় দৃঢ়তর! অহো কি লোকের সাহচর্যের সৌভাগ্যই না করিয়াছি।

সম্পাদক ঘাড়ের উপরে টার্কিশ-তোয়ালেখানা ফেলিয়া বলিলেন—একটু বসুন, আমি আসিতেছি।

সম্পাদক গেলে ইন্দ্র সহকারীদিগকে বলিলেন—আপনারাও মহানুভব ব্যক্তি, আপনাদের দাদাকে অমরত্ব লাভে সাহায্য করুন না কেন?

সকলে কহিল—বুঝিয়াছি। আমাদের কিছু পুরস্কার দিন—আপনার কাজ করিয়া দিতেছি।

ইন্দ্র ভাবিলেন, কি দিলে ইহারা খুসি হইবে।

সকলে বলিল—বেশি কিছু নয়—এক প্যাকেট করিয়া সিজার্স্ সিগারেট পাইলেই হইবে।

ইন্দ্র সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন।

অমনি সহকারীগণ বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িয়া (সম্পাদক যেখানে মধ্যাহ্নের স্নান সারিতেছিলেন) বিনা বাক্যব্যয়ে গলা টিপিয়া সম্পাদককে মারিয়া ফেলিয়া ইন্দ্রকে বলিল—দাদা অমর হইয়াছে, হাড় লইয়া যান।

ইন্দ্র ভাবিলেন—সর্বনাশ, এ সব দৈত্য স্বর্গ আক্রমণ করিলে কেমন করিয়া রক্ষা করা যাইবে! যাহা হোক—তিনি হাড লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

[৩]

সেই হাড়ে বিশ্বকর্মা নূতন বজ্র গড়িল। ইন্দ্র যুদ্ধোপলক্ষ্যে তাহা দৈত্যদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সম্পাদকীয় বজ্র সপ্তভুবন কম্পিত করিয়া দৈত্য কুলকে নিঃশেষে পুড়াইয়া মারিল। স্বর্গ

নির্দৈত্য হইল। ইন্দ্র পুনরায় সিংহাসনে বসিল—দেবগণ স্বর্গ অধিকার করিল।

ইন্দ্র সম্পাদকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ময়দানবকে দিয়া তাঁহার একটা পাথরের মূর্তি গড়াইয়া সভাগৃহের কোণে স্থাপন করিলেন। পাথরের মূর্তি স্থাণুবৎ রহিল—কেবল উর্বশী নাচিতে আরম্ভ করিলে সেই পাথরের মূর্তি নড়িয়া চড়িয়া উঠিত।

দেবতারা ভাবিত, শিল্পীর কৌশলে মূর্তি জীবন্তবৎ। কিন্তু মানুষেরা জানে আসল ব্যাপার কি!

টেনিস-কোর্টের কাণ্ড

টেনিস-কোর্টে ইতিহাসের দুটি বড় ঘটনা ঘটিয়াছে। একটির কথা ফরাসী বিপ্লব উপলক্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আর একটি অজ্ঞাত। আজ তাহারই কথা বলিব। শেষেরটি রজতরঞ্জনের জীবনে বিপ্লব আনিয়াছে।

রজতরঞ্জন ধনীর পুত্র, কোন জিনিসের অভাব তাহার ছিল না, এমন কি বুদ্ধিরও নয়। স্কুল হইতে কলেজ, কলেজ হইতে চাকুরী, সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়াছে। কেবল বিবাহটা বাকী। যাহার এতগুলা বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, ওটা তাহার কাছে তুচ্ছ। বন্ধুরা ভাবিত রজত কবে না জানি রাজকন্যার সংবাদে তাহাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিবে। রজত নিজেও তাহা অবিশ্বাস করিত না।

রজত ধনী, কিন্তু ধন সব চেয়ে বড় মূলধন নয়। বড় লোকের ছেলে শিশু বয়স হইতে পৃথিবীকে নিজের বলিয়া ভাবিতে শেখে ; বয়স বাড়িলে এই আত্ম-প্রত্যয় তাহার সব চেয়ে বড় সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। স্কুল হইতে যে-ছেলে অভাবে জীবন শুরু করিল, সৌভাগ্যের পূর্ণতম কোটালেও তাহার আত্ম-প্রত্যয় আর ফিরিয়া আসিবে না। রজতরঞ্জন আত্ম-প্রত্যয়ের ধনে ধনী। কোন রাজকন্যা যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, ইহা সে কল্পনাই করিতে পারিত না। এবং খুব সম্ভব সে বিশ্বাস করিত, একদিন এস্প্লানেডের মোড়ে, রাজার পাটহাতী তাহাকে শুঁড়ে করিয়া পিঠে তুলিয়া লইবে।

এহেন রজতরঞ্জন জীবনে একবার ঠকিয়াছিল ; ঠিক ঠকে নাই,

কেবল তাল কাটিয়া গিয়াছিল, 'লনে' আসিবার পূর্বেই সানাইয়া লইয়াছিল। গল্পটি তাহারই ইতিহাস।

বালিগঞ্জ পার্কের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একবার বৃত্তাকারে চোখ ঘুবাইয়া লইলে যে-বাড়ীটা উচ্চতম বলিয়া মনে হয়, তাহার একমাত্র মালিক শ্রীমতী রেবা রায়,—সুন্দরী, শিক্ষিতা, প্রাপ্তবয়স্কা, ধনী এবং সম্পূর্ণ ভাবে অভিভাবকহীন। এক কথায়, উক্ত অঞ্চলের যুবকদের পক্ষে এই তন্বী রমণী অদৃশ্য মৎস্য-লক্ষ্যের মত একান্ত দুর্লভরূপে বিরাজিত। কত হতভাগ্য যে শ্রীমতী রেবার পাষাণ সোপানে ভগ্নহৃদয় হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে বলিয়াই, বোধ হয়, কেহ লিখিয়া রাখে নাই। শেষে সকলের বিশ্বাস জন্মিল, এ লক্ষ্য কেবল রজতরঞ্জনের আয়ত্তাধীন।

রজতরঞ্জন বিকাল বেলা ক্লাবে টেনিস খেলিতেছিল। বন্ধুরা আসিয়া বলিল,—"রজত, এতদিনে তোমার যোগ্য মেয়ে পাওয়া গেছে, বিয়ে কর।" বন্ধুদের কাছে আদ্যন্ত ইতিহাস শুনিয়া সে বিস্মিত হইল; তাইত, তাহার বাড়ীর এত নিকটে রাজকন্যা, আর সে তাহা লক্ষ্য করে নাই, কেবল অফিস ও টেনিস লইয়া মত্ত। অন্য যুবকদের ভগ্ন হৃদয়ের ইতিহাস তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না, বরঞ্চ ভাবিল, তাহার মত এমন সুদক্ষ ভাস্করের নিপুণতা প্রকাশের পক্ষে এমন কঠিন পাষাণেরই আবশ্যক। রজত হাসিয়া বলিল, আচ্ছা রাজি,—ভিনি, ভিডি, ভিসি। বন্ধুরা খুসী হইয়া ফিরিয়া গেল।

যুদ্ধে বিপক্ষের দৃঢ় ঢালখানার উপরে যত আক্রোশ, মানুষটার উপরে তত নহে। দুই পক্ষের মধ্যে ঐ ঢালখানার অন্তরাল না থাকিলে বর্বরের মত হানাহানি হয়তো সম্ভব হইত না। ঢাল ভাঙ্গা লক্ষ্য, মানুষ মারা উপলক্ষ্য। তেমনি রমনীর কৌমার্যের আবরণ পুরুষের পৌরুষকে যেন ধিক্কার দিতে থাকে। কৌমার্যকে সে হিংসা করে,

নারীকে হয়তো ভালবাসে। সেইজন্য অত্যন্ত পৃথক হইলেও একত্রে বাস করে। ডন জুয়ান, ক্যাসানোভা কৌমার্য-ভেদের চ্যাম্পিয়ান বলিয়াই এত দোষ সত্ত্বেও আজও তাহারা বাঁচিয়া আছে। রজত আজ সেই ব্রত গ্রহণ করিল দেখিয়া নিজেদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও বন্ধুরা খুসি হইয়া ফিরিল। এ খুসি যতটা রজতের আসন্ন বিজয়ে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি রেবার অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ে।

পরদিন বজত রেবার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রসাধন করিতে লাগিল। ঢাকাই ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, কাশ্মীরী শাল। বন্ধুবা দেখিল হ্যাঁ, রজতকে মানাইয়াছে বটে। তাহারা চট্ করিয়া একখানা ছবি তুলিয়া লইল। রজত সুবৃহৎ মোটর হাঁকাইয়া বেবার বাড়ীতে গিয়া নামিল। চাকরকে দিয়া নিজের কার্ড পাঠাইয়া দিল, এবং কয়েক মিনিট পরে ভৃত্য তাহাকে পথ দেখাইয়া শ্রীমতী রেবাব বৈকালিক চায়ের টেবিলে লইয়া উপস্থিত কবিল। পব দিন বন্ধুরা উদগ্রীব হইয়া রজতের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। খবর পাইল, রজত বাড়ী নাই, কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছে। সকলে তাকাইয়া দেখিল শ্রীমতী রেবার বাড়ীর জানালাগুলি খোলা।—অর্থাৎ রজত একাই গিয়াছে। সকলে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল, রজতেবও পরাজয় ঘটিয়াছে, যে রজত ইতিপূর্বে কখনো কোন কাজে পরাজিত হয় নাই।

পশ্চিমে ঘুরিয়া মাসছয় পরে রজত ফিরিল। ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত পরাজয়ের স্মৃতি অনেকটা সে ভুলিয়াছে; বোধ করি, পাণিপথ প্রভৃতি বড় বড় ঐতিহাসিক পরাজয়ের স্থানগুলি দর্শনই তাহার কারণ। অনেকদিন পরে সে টেনিস ক্লাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার মধ্যে ক্লাবে একটু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। টেনিস কোর্টের দুই পাশে খানকয়েক

বেঞ্চি পড়িয়াছে, বিকাল বেলা মেয়েরা বসিয়া খেলা দেখে, বোধ হয়, কো-প্লেইং হইবার ইহা সূত্রপাত।

রজত দুটো 'গেম' খেলিয়া তৃতীয় 'গেম'এ একটা সমুন্থত বলকে যেমনি 'স্ম্যাশ্' করিতে যাইবে, হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল বামদিকের বেঞ্চিতে একটি তন্বীর প্রতি, বল ফসকাইয়া গেল, রজতের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তারপর হইতে রজতের হাতে ক্রমাগত বল ফসকাইতে লাগিল। খেলা আর জমিল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। রজত ডানদিকের বেঞ্চিতে গিয়া বসিল। খেলোয়াড় ও দর্শকের দল কমিয়া গেলে বামদিকের বেঞ্চি ডানদিকে সরিয়া আসিল, অর্থাৎ বামদিকের তন্বী রজতের নিকটে আসিয়া নমস্কার করিল। রজত মর্মান্তিকভাবে দেখিল বালিগঞ্জের উচ্চতম বাড়ীর মালিক—শ্রীমতী রেবা রায়। রেবা যাচিয়া তাহার সহিত আলাপ করিল, কিন্তু ছয়মাস আগেকার সেদিনের কোন কথার উল্লেখ করিল না। আলাপ কি হইল জানিনা, অন্তত জানিবার দরকার নাই। রজত ও রেবা পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসিয়া রহিল। শান-বাঁধানো টেনিস কোর্ট মিশ্রিত জ্যোৎস্না ও বিদ্যুতালোকে চক্‌চক করিতে লাগিল। অদূরে বাড়ীর বারান্দায় খাঁচার কোকিল বনের কোকিলের উদ্দেশে ডাকিতে লাগিল, এবং মাঘের শেষে হঠাৎ দক্ষিণে হাওয়ায় ফুলের বদলে দেওয়ালের রঙ্গিন কাগজের শুষ্ক প্রান্ত ক্রমাগত ফরফর করিতে লাগিল। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে কলিকাতায় অকাল বসন্ত আনয়ন করিতে হইলে স্বয়ং ঋতুরাজও ইহার বেশি আয়োজন করিতে পারিবেন না। পাঠক হয়তো ভাবিতেছেন এবার দুজনের বিবাহ ঘটিবে, কিন্তু তাহা নয়; কারণ, এত সহজে বিবাহ স্বয়ং বালিগঞ্জেও ঘটে না। উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথা ওঠে নাই বটে, কিন্তু পূর্বরাগের সূত্রপাত হইল। রজত ছয় মাসের

গ্লানির চিহ্ন সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া এবং রেবা রায়কে নিজের মোটরে করিয়া তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল।

সে রাত্রে রজতের ঘুম হইল না; পাঠক ভাবিতেছেন পূর্ব্বরাগের উত্তেজনায়; তাহা নয়, অকাল বসন্তের দরুন গরমে। সে ভাবিতে লাগিল এই ছয় মাসের মধ্যে তাহার কি এমন পরিবর্তন হইয়াছে, যাহাতে রেবার এমন ভাব উপস্থিত হইল। সেদিন রজত যাচিয়া দেখা করিতে গিয়াছিল, পাইয়াছিল এক পেয়ালা চা ও গোটা কয়েক অর্ধোচ্চারিত শব্দ। আর আজ রেবা সাধিয়া আসিয়া আলাপ করিল। সে আলাপ আবার—। রজত নিজের কক্ষে একাকী পায়চারী করিতে লাগিল। দেয়ালে টাঙানো ছিল কাশ্মীরী শালপরা তাহার সেই ছবি, বন্ধুরা তুলিয়াছিল ছয় মাস পূর্বে। মূল্যবান শালের ভাঁজে ভাঁজে স্কন্ধ হইতে পা পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে, জাগিয়া আছে কেবল তাহার সৌম্য সুন্দর মুখখানি! রজত এখনো ভাবিতে পারিল না—কোন তরুণী এতখানি সৌন্দর্যকে অবজ্ঞা করিতে পারে, বিশেষ যখন প্রচুর অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিয়া সে সৌন্দর্যকে এমন সুন্দরভাবে ব্যালান্স করিয়া রাখিয়াছে। রজত পায়চারী করিতে করিতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল—ইস্, এত রাত পর্যন্ত সে টেনিস খেলিবার পোষাক পরিয়া আছে। বৃহৎ দর্পণে তাহারই ছায়া ফ্লানেলের শাদা পায়জামা, শাদা কেড্‌স, শাদা শার্ট, আর সুনিপুন কারিগরের হাতের তৈরী কালো সার্জের একটি কোট। না। ইহাতেও তো রজতকে মন্দ মানায় না! কিন্তু তাই বলিয়া কাশ্মীরী শালের সহিত টেনিস কোটের তুলনা! রজতের বিস্ময় বাড়িল বই কমিল না। সে একবার ছবিখানার দিকে তাকাইল, একবার ছায়াখানার দিকে! ছবিতে বেশ একটা আভিজাত্যের আবরণ আছে, আর টেনিসের কোট বড়ই যেন চাছা-ছোলা, বড়ই যেন

বে-আব্রু! রজতের মনে হইল টেনিসের কোট বে-আব্রু হোক, তবু যেন তাতে রজতের ব্যক্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে, আর কাশ্মীরী শালের অহেতুক ঔদার্যে তাহার অর্থের প্রাচুর্য প্রকাশ হইতেছে। অনেকক্ষণ ছায়া ও ছবির তুলনা করিয়া শেষে যেন ছায়াটিই তাহার বেশি ভাল লাগিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাতে মানুষটার কি এমন বদল হইয়াছে যে, সর্বজনকাম্য রেবা রায় তাহাকে এমন ভাবে গ্রহণ করিল? রজত উত্তর ভাবিয়া না পাইয়া টেনিসের পোষাক ছাড়িয়া ফেলিল। গরম পোষাক ছাড়িতেই তাহার ঘুম আসিল। তখন আর পূর্বরাগের উত্তেজনাও তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে পারিল না। রজত ঘুমাইয়া পড়িল।

রজত, আমি তখন যদি থাকিতাম, তবে তোমার সমস্যার সমাধান করিয়া দিতাম; হ্যামলেটের মত বলিতাম—Look at this picture and look at that! ছবি ও ছায়া দেখ! কাশ্মীরী শালে তোমার ব্যক্তিত্ব ঢাকা পড়িয়াছে, টেনিস-কোটের গাত্রলগ্ন আঁট-সাট ভাজে তোমার ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট চোখে পড়ে। মেয়েরা পৌরুষকে কামনা করে। ছয় মাস আগে রেবা তোমার মধ্যে অর্থের ঔদ্ধত্যমাত্র দেখিয়াছিল, আজ দেখিয়াছে রজতরঞ্জন রায়কে, টেনিস খেলোয়াড়কে; যদিচ রেবাকে লক্ষ্য করিবার পরে, আর তুমি ভাল খেলিতে পার নাই। যে পোষাকে মানুষের দেহকে ঢাকে অথচ ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে, তাহাই আদর্শ পরিচ্ছদ। রজতরঞ্জন, তোমার ব্যক্তিত্বের যোগ্য পোষাক ওই টেনিসের কোট।

সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম না।—এবং এত কথাও বলিতে পারি নাই। কিন্তু তাহাতে রজতের ঘুমের কোন বিঘ্ন ঘটে নাই, ইহা বিশ্বস্ত-সূত্রে শুনিয়াছি।

কল্কি

তখন বিশ্বের সৃষ্টি হয় নাই। সে সময়ে আকাশ-সমুদ্র, উর্ধ্ব-অধঃ, দশ-দিক এবং নবগ্রহ কিছুই ছিল না। তখন মরুৎগণ ছিল না, সরিৎগণ ছিল না, উদ্ভিদ ছিল না, প্রাণী ছিল না। উষা সন্ধ্যা তখন ছিল না, চন্দ্র সূর্য ছিল না। যাহা কিছু এখন আমরা দেখি এবং যাহা কিছু এখন আমাদের চিন্তার বিষয়—সে সব কিছুই ছিল না। ছিল কেবল নিষ্কলঙ্ক শূন্যতা। একমাত্র শূন্যতা থাকার জন্য তাহাও ছিল না। সেই অসৎবৎ শূন্যতায় বিধাতা পুরুষ একাকী ছিলেন।

একাকী বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার বিরক্তিবোধ হইল। তিনি বিশ্বকর্মাকে সৃষ্টি করিলেন। বিশ্বকর্মা তাঁহাকে শুধাইল—প্রভু কি করিতে হইবে? বিধাতা বলিলেন—তুমি বিশ্ব সৃষ্টি করো।

বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বসৃষ্টিতে নিযুক্ত হইল। তখন দেখিতে দেখিতে নীল আকাশের চন্দ্রাতপে গ্রহ-সূর্যের দল সঞ্চরণ করিতে লাগিল, মরুৎগণ প্রবাহিত হইল, সরিৎগণ ধাবিত হইল, পাহাড় পর্বত সদ্যনিদ্রোত্থিতের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে সমুদ্র দেখা দিল, উদ্ভিদ দেখা দিল, বিচিত্রবর্ণের প্রাণী দেখা দিল। উষার সঙ্গে আলো আসিল, সন্ধ্যার সঙ্গে আসিল অন্ধকার। বর্ষ-চক্রের আবর্তনের প্রহরে প্রহরে ঋতুগণ আসিল।

বিশ্বকর্মা বলিল—প্রভু একবার সৃষ্টি দেখুন।

বিধাতা বলিলেন—সুন্দর। কিন্তু কে এই সৌন্দর্য ভোগ করিবে? ইহা ভোগ করিবার জন্য মানুষ সৃষ্টি করো।

বিশ্বকর্মা নরনারী দু-দলের সৃষ্টি করিল। আর তাহাদের বসবাসের জন্য স্বর্গের প্রান্তে নন্দনবন নামে সর্ব্বসুষমাভূষিত এক কানন সৃষ্টি হইল।

বিধাতার অনুজ্ঞা বহন করিয়া বিশ্বকর্মা তাহাদের বলিল—এই নন্দনবন তোমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট। তোমরা এখানে চিরকালের জন্য বাস করিবে। যাহা প্রয়োজন সমস্তই মিলিবে। কেবল বনের উত্তর দিক্‌টাতে যাইবে না। এবং আমার ছাড়া আর কাহারও কথায় কান দিও না। যাও, এখন তোমাদের নূতন আবাস একবার ঘুরিয়া দেখ। এই বলিয়া বিশ্বকর্মা প্রস্থান করিল।

নর নারী নন্দনবন ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইল। চারিদিকে সবুজ গাছ ; গাছের শাখায় শাখায় ফুল আর ফল। মাঝখান দিয়া ছোট একটি নদী প্রবাহিত। নদীর ধারে ছোট একটি পাহাড। পাহাড়ের মধ্যে একটি গুহা।

আরও কিছুদূর গিয়া তাহারা দেখিতে পাইল একটি সরোবর। তরল পান্নার মতো তাহার জল। জলে অসংখ্য পদ্ম। বাতাস বহিলে পদ্মে, পদ্মপাতায় আর জলে মাতামাতি লাগিয়া যায়। তাহারা উপরে চাহিয়া দেখিল নীল আকাশ। আকাশের গায়ে হাঁসের পালকের মতো লঘু মেঘের খণ্ড। এত সৌন্দর্য তাহারা, কল্পনাও করিতে পারে নাই। প্রতিদিন তাহারা নূতন নূতন সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়া ফেরে—কেবল উত্তর দিক্‌টাতে যায় না।

একদিন দুপুরবেলা পুরুষটি যখন নিদ্রিত, নারী একাকী নন্দন ভ্রমণে চলিল। হঠাৎ মনে হইল কে যেন তাহার কানে কানে বলিতেছে—একবার উত্তর দিকে চলো না। সে চমকিয়া উঠিল। কে এমন কথা বলে ? তাহারা ছাড়া এ বনে তো আর কেউ নাই। সে ভয় পাইয়া

ফিরিয়া আসিল। পুরুষটি শুধাইল উত্তর দিকে যাওনি তো ; নারী বলিল—না। অপরিচিত কণ্ঠস্বরের কথা সে চাপিয়া গেল।

কৌতূহল নারী চরিত্রের ধর্ম। সে আবার পরদিন মধ্যাহ্নে একাকী বাহির হইল। আবার সেই কণ্ঠস্বর। "উত্তর দিকটা দেখিলে দোষ কি ? সেদিকটা এদিকের চেয়েও সুন্দর।" নারী ভয় পাইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু প্রত্যেকদিন একই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে তাহার ভয় অনেকটা ভাঙিয়া গেল—সে সাহসে বুক বাঁধিয়া একাকী একদিন উত্তর দিকে চলিল। সেই কণ্ঠস্বর তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল—সাহস দিতে দিতে, বাহবা দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

রমণী দেখিল—সত্যই উত্তর দিকটা অন্য সব দিকের চেয়ে সুন্দরতর। এত রঙ্, এত গান, এত গন্ধ অন্যদিকে সে কি দেখিয়াছে ! কিন্তু সব চেয়ে তাহার কাছে যাহা বিস্ময়জনক লাগিল তাহা একটি অদ্ভুতদর্শন কালো বস্তু। বৃহদাকার নল ও চক্র সমন্বিত একটি কালোপদার্থ অনেকটা জায়গা জুড়িয়া দণ্ডায়মান।

অদৃশ্য-ব্যক্তির কণ্ঠস্বর তাহাকে যেন উৎসাহ দিবার জন্যই বলিল—বাঃ কি সুন্দর। আরও একটু কাছে যাওনা।

কিন্তু অপরিচিত বস্তুর কাছে যাইবার সাহস তাহার হইল না। সে ভয় পাইয়া দ্রুত ফিরিয়া আসিল। দ্রুত ফিরিয়া আসিল কিন্তু সারারাত্রি ধরিয়া স্বভাবজ কৌতূহল তাহাকে খোঁচাইতে লাগিল। একবার দেখিলে এমন কি দোষ হইত !

পরদিন আবার সে সেই বস্তুটির কাছে গেল। কণ্ঠস্বর বলিল—একবার স্পর্শ করিয়া দেখো না। কিন্তু নারী আর অগ্রসর হইল না। এইরকম করিয়া দিনের পর দিন তাহার কৌতূহল ও ধৈর্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। পুরুষটি ইহার কিছুই জানিতে পারিল

না। সে দুপুরবেলা পড়িয়া ঘুমায়—এসব জানিবার তাহার সময় কোথায় ?

অবশেষে রমণীচরিত্রের কৌতূহলেরই জয় হইল। সে স্থির করিল—একবার বস্তুটিকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে। স্পর্শ করিতে এমন কি দোষ!

সেদিন দুপুরবেলা সেই কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করিয়া সে বস্তুটির কাছে গেল এবং তাহার উৎসাহবাক্যে সাহস সঞ্চয় করিয়া বস্তুটিকে আল্‌গোছে একবার স্পর্শ করিল। অমনি সেই কালো বস্তু যেন সজীব হইয়া উঠিল। চাকা ঘুরিয়া উঠিল, নল হইতে ধোঁয়া ও আগুন স্ফুরিত হইতে লাগিল—আর সে কি বিষম গর্জন? সে ভীত হইয়া এক দৌড়ে পালাইয়া চলিয়া আসিল। আসিতে আসিতে শুনিল—যেন অদৃশ্য কোন ব্যক্তির হাসি তুষারকণার মতো চারিদিকে বিকীরিত হইতেছে। পুরুষটিকে কিছুই জানাইল না।

এদিকে বৈকুণ্ঠে বিধাতার আসন টলিয়া উঠিল। তিনি বিশ্বকর্মাকে বলিলেন—একবার নন্দনে যাও তো। নরনারী যদি নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তবে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে ভুলিও না।

বিশ্বকর্মা আসিয়া নরনারীকে বলিল—তোমরা বিধাতার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ। উত্তরদিকের সেই কালোবস্তুটিকে তোমরা স্পর্শ করিয়াছ।

পুরুষ বলিল—না। নারী নীরব হইয়া রহিল।

সমস্ত বুঝিতে পারিয়া পুরুষ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে রাক্ষসী—তুই কি সর্বনাশ করিয়াছিস। তারপরে সে বিশ্বকর্মার পায়ের উপর গিয়া পড়িয়া বলিল—ক্ষমা করুন।

বিশ্বকর্মা বলিল—বিধাতার ক্ষমার নাম প্রায়শ্চিত্ত। তোমাদের

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তোমাদেব নন্দন ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

—কোথায়?

—পৃথিবীতে।

পুরুষটি বলিল—পৃথিবী! সে আবার কি? সে কোথায়?

বিশ্বকর্মা নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন—ওই যে ক্ষুদ্র মৃৎকণা—ওটাই পৃথিবী।

পুরুষ ব্যাকুলভাবে বলিল—ওখানে গিয়া কি করিব?

—প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

—কেমনভাবে তাহা করিতে হইবে?

বিশ্বকর্মা বলিল—জরা মৃত্যুর অধীন হইয়া, রোগ শোক আধিব্যাধির অধীন হইয়া, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্যের ক্রীতদাসরূপে পরিশ্রম করিয়া এই পাপ ক্ষালন করিতে হইবে।

—কতদিন লাগিবে?

—কোটি কোটি বৎসর, লক্ষ লক্ষ পুরুষের জন্মজন্মান্তব গ্রহণ।

পুরুষটি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। নাবী চোখে আঁচল চাপিয়া ধরিল।

—আব—এখানে ফিবিতে পাইব না?

বিশ্বকর্মা ব'লল—না।

পুরুষটি যেন আপনমনেই বলিয়া উঠিল—কি সবনাশ।

বিশ্বকর্ম্মা সান্ত্বনাব সুরে বলিল—এখানে ফিরিতে পাইবে না বটে, তবে পৃথিবীই নন্দনে পরিণত হইবে।

পুরুষ সাগ্রহে শুধাইল—কবে?

—যে অপরাধ করিয়াছ তাহাব মাত্রা ক্ষয় হইলেই।

—কেমন করিয়া জানিতে পারিব যে অপরাধের ক্ষয় হইল ?

বিশ্বকর্মা বলিল—অপরাধের মাত্রা যখন পূর্ণ হইবে, তখনি বুঝিবে যে এবারে মহাপুরুষের আবির্ভূত হইবার লগ্ন সমুপস্থিত। নিশান্তের অন্ধকারতম ক্ষণেই তো সূর্যোদয় হইয়া থাকে।

—সেই মহাপুরুষের কি নাম ?

—নামের দ্বারা তাঁহাকে বুঝিবার আশা করিও না। কিন্তু যদি নিতান্তই নাম চাও, তবে শোন তাঁহার নাম—কল্কি।

এই বলিয়া বিশ্বকর্মা বলিল—এখন তোমরা বিদায় হইবার জন্য প্রস্তুত হও।

নরনারী প্রস্তুত হইতে লাগিল—বিশ্বকর্মা প্রস্থান করিল।

যখন দুইজনে নন্দনের বাহিরে আসিয়াছে তখন এক ব্যক্তি তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার পিছনে চক্রচালিত সেই কালোবস্তুটি।

নারী চমকিয়া উঠিল।

পুরুষ শুধাইল—ব্যাপার কি ?

সেই লোকটি বলিল—এই বস্তুটি স্পর্শ করিবার দোষেই তোমাদের নির্বাসন। এটাকে ছাড়িয়া কেন যাও; এটাকে পৃথিবীতে লইয়া যাও। ওই যে শুনিলে পৃথিবী নন্দনে পরিণত হইবে—তাহা এই বস্তুটির কৃপাতেই।

পুরুষ বলিল—ইহার কৃপায় কি পাইব ?

সেই ব্যক্তি বলিল—অনন্ত ঐশ্বর্য, কল্পনাতীত সুখ।

—শান্তি পাইব কি ?

—না।

তবে চাই না।

সেই ব্যক্তি বলিল—তোমাদের জন্য না চাও, তোমাদের পুত্র-পৌত্রের জন্যও কি চাও না?

পুরুষ নীরব। রমণী বলিল—চাই।

সেই ব্যক্তি উৎসাহ দিয়ে বলিল—এইতো নারীর মতো কথা। এই বস্তুটির গুণের অন্ত নাই। ইহার গুণে তোমরা এমনি ক্ষমতাবান হইবে যে বিধাতাকে আর প্রয়োজন হইবে না। নিজেরাই নিজের বিধাতা হইতে পারিবে।

পুরুষ শুধাইল—বস্তুটির কি নাম?

সেইব্যক্তি বলিল—যন্ত্র।

—তোমার কি নাম?

সে ব্যক্তি বলিল—শয়তান।

এই বলিয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল। নর-নারী, সেই আদি-দম্পতি সেই যন্ত্রটিকে টানিয়া লইয়া পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করিল।

প্র-না-বি-র সঙ্গে ইণ্টারভিউ

প্র-না-বি থাকেন সাঁওতাল পরগণার ছোট একটি শহরে। সেখানে তাঁর ছোট একটি বাড়ি আছে। বিচিত্র গঠনের এই বাড়িটি। বাড়ির কম্পাউণ্ড প্রকাণ্ড, চারদিকে আম, শাল, মহুয়ার গাছ; শিউলি, স্থলপদ্ম, রক্তকরবী, জবার গাছও অনেক। মাঝখানে অনেকটা পরিষ্কার জায়গা। সেখানে বাড়িটি। আগাগোড়াই কাঠের তৈয়ারী। এই কাঠের বাড়িখানা এমনভাবে তৈরি, যাতে যখন যেদিকে সূর্য থাকে সেদিকে ঘোরানো যায়। এইজন্যই বাড়িটির নাম সূর্যমুখী। দুদিকে ছোট ছোট দুটি ঘর; একটাতে প্র-না-বি'র পড়বার জায়গা, আর একটাতে বসবার এবং বিশ্রামের স্থান। মাঝখানের বড় হলটার কাঠের দেয়ালে কতকগুলি বন্দুক টাঙানো। দেয়াল এবং মেঝের প্রায় সবটাই পশুচর্মে আবৃত। প্র-না-বি'কে সবাই লেখক এবং বিদূষক বলিয়াই জানে। কেহই জানে না যে, তিনি একজন বড় শিকারী। আমিও জানিতাম না।

সেদিন আমি একজন আমেরিকান বন্ধুর সঙ্গে প্র-না-বি'কে দেখিবার জন্য গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই আমেরিকান বন্ধুটি যুদ্ধের আগে ছিলেন আমেরিকার কোন এক কলেজের অধ্যাপক। যুদ্ধ বাধিলে কয়েক বছর তাঁর দেশে-বিদেশে বনেপাহাড়ে ঘুরিয়া কাটে। শেষের দিকে কিছুকাল হইতে কলিকাতাতেই আছেন। এখন তাঁর দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এদেশ হইতে বিদায় লইবার আগে তিনি এখানকার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে একবার দেখাসাক্ষাৎ করিয়া

যাইতে চান। দেশে গিয়া তিনি "My India" নামে একখানি বই লিখিবেন, তারই উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। আমার সঙ্গে প্র-না-বি'র পরিচয় আছে জানিয়া তিনি আমাকে ধরিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া আমি আজ প্র-না-বি'র কাছে উপস্থিত হইলাম।

প্র-না-বি'র সঙ্গে আমার এক সময়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বটে; কিন্তু তারপরে বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ নাই। তখন তিনি থাকিতেন কলিকাতায়। সেদিনকার প্র-না-বি'কে লেখক বলিয়াই জানিতাম—এখন তাঁহার শিকারের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু প্র-না-বি'র সম্বন্ধে বিস্ময়টা বাহুল্য। তিনি কি এবং কি নহেন, কি করিয়াছেন এবং কি করিতে পারেন—তাহার সম্বন্ধে শেষ কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মাঝখানের হলঘরটাতে বসিলেন। একটা স্প্রিং জাতীয় কোন যন্ত্র টিপিতেই সমস্ত বাড়িটা ঘুরিয়া সূর্যমুখী হইল। শীতের আরামপ্রদ সূর্যের আলোতে ঘরটা ভরিয়া গেল।

আমি আমেরিকান বন্ধুটির পরিচয় দিয়া বলিলাম—আপনি যে শিকারী, একথা জানতাম না।

প্র-না-বি হাসিয়া বলিলেন—শিকারী তো আমি বরাবরই। কলম দিয়া মানুষ শিকার করি, আর বন্দুক দিয়া চলে ভালুক শিকার। তবে তারা আমার সম্পূর্ণ পরিচয় জানে না—এইমাত্র। মানুষে ভাবে আমি মানুষ-শিকারী। পশু তো ভাবে কেবল পশুকেই মারি।

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন—প্রত্যেক লেখকের পক্ষে শিকারের অভ্যাস রাখা দরকার। তাতে অভ্যাসের ব্যালান্সটা থাকে। অবশ্য প্রত্যেক শিকারী যে লেখক হয়ে উঠবে—এমন আশা করা উচিত নয়।

তারপরে আমেরিকান বন্ধুটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—পশ্চিমের লোকেরা শিকারটা খুব বোঝে। পৃথিবীতে জন্তুজানোয়ার যতই কমে আসছে—মানুষ-শিকার ক'রে তারা সেই অভাব পুষিয়ে নিচ্ছে।

আমেরিকান বন্ধুটি বলিলেন যে, আমাদের দেশের কোন বড় লেখককে শিকারী বলে জানি না। এবারে দেশে ফিরে যাতে তারা শিকার অভ্যাস করে, তার চেষ্টা করবো।

প্র-না-বি বলিলেন—শিকার করাটা কঠিন নয়। ওর 'ফিলজফিটা' ধরাই কঠিন। ফিলজফির সঙ্গে সংযুক্ত না হ'লে শিকারটা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু নয়।

ক্রমে সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল। আমেরিকান অধ্যাপকটি প্রশ্ন তুলিলেন—বর্তমানে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত না হওয়ার কারণ কি? দান্তে-সেক্সপীয়র-গ্যেটের ভাব-বংশ কি একেবারেই লুপ্ত হইল? এমন কেন হয়?

প্র-না-বি বলিলেন—কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ওঁদেরই সমকক্ষ। তবে একথাও সত্য যে, তিনিই বোধ করি পৃথিবীর শেষ মহাকবি।

ইহা শুনিয়া বন্ধুটি বলিলেন—তবে তো আপনি আমার কথাই সমর্থন করছেন।

—করছি বইকি।

—এর কারণ কি?

প্র-না-বি শুরু করিলেন—মানুষের অস্তিত্বের তিনটি স্তর আছে। প্রাণস্তর, বুদ্ধিস্তর আর আত্মাস্তর। প্রাণস্তরে মানুষ প্রায় পশুর সামিল। এই প্রাণস্তরের সৃষ্টি তার সংসার। এটা কেবল প্রয়োজন সাধনেরই উপায়। তার দেহ ধারণের কৌশল। বুদ্ধিস্তরের সৃষ্টি জ্ঞান-বিজ্ঞানের

অধিকাংশ শাখা। মানুষ যাকে দর্শন বলে, বিজ্ঞান বলে, আইন বলে, স্থায়-শাস্ত্র বলে—এসব বুদ্ধিস্তর থেকে উদ্ভূত। আর আত্মাস্তর থেকে সৃষ্টি হয়েছে তার ধর্ম এবং শিল্প। এইজন্যই ধর্ম এবং শিল্প মূলত এক। হোমার থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনার মূল রয়েছে আত্মার গভীরতায় নিহিত।

বন্ধুটি বলিলেন—আপনি যাকে আত্মা বল্‌ছেন, তা যদি ইংরেজি "soul" হয় তবে বল্‌বো যে, তার কোন প্রমাণ নেই। পশ্চিম এক সময়ে অপ্রতিপাদ্য "soul"কে স্বীকার করতো—এখন আর করে না।

প্র-না-বি হাসিয়া বলিলেন—তা আমি জানি। পূর্বদেশীয় আমরাও "soul"-এ বিশ্বাস ক্রমে হারিয়ে ফেলছি—আর কিছুকালের মধ্যে আমরাও "soul" সম্বন্ধে পশ্চিমের উপযুক্ত শিষ্য হ'য়ে উঠ্‌বো। কিন্তু প্রমাণের কথাই যখন উঠ্‌ল—তখন বলি যে, ভগবানের অস্তিত্বেরও তো কোন প্রমাণ নেই।

বন্ধুটি বলিলেন—প্রমাণ নেই, কিন্তু বিশ্বাস আছে।

প্র-না-বি বলিলেন—এই বিশ্বাস বা "faith" মানুষের আর একটা অস্ত্র—ঠিক প্রমাণের মতোই বা তার চেয়েও বড়। বড এই জন্য যে, বুদ্ধিস্তরের অস্ত্র হচ্ছে প্রমাণ—আর আত্মাস্তরের অস্ত্র বিশ্বাস।

আমি শুধাইলাম—আর প্রাণস্তরের ?

প্রাণস্তরের অস্ত্র—প্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রমাণ এবং বিশ্বাস নিয়ে ত্রিস্তরী মানুষ বিশ্ব বিজয়ে বের হ'য়েছিল। অবস্থাগতিকে দেখা যাচ্ছে, সে আত্মাস্তর আর তার অস্ত্র হারিয়ে ফেলেছে। তাতে ক'রে সে কি দীনতর হ'য়ে পড়েনি! এই দীনতারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তার শিল্প এবং ধর্মজীবনের ন্যূনতায়। মহাকবিদের কাব্য-সৃষ্টি

হয় আত্মান্তর থেকে একথা আগেই বলেছি। এখনকার অধিকাংশ কবি কাব্য রচনা করেন বুদ্ধিস্তরে দাঁড়িয়ে। বিশেষ ক'রে তাঁদের দোষ দেওয়া অন্যায়। কারণ সমস্ত পৃথিবীটাই আত্মান্তর থেকে স্খলিত হ'য়ে নেমে পড়েছে। এখন কবি ও পাঠকের একই সঙ্গে অধোগতি হ'য়েছে—তারা একই স্তরে দাঁডিয়ে। সেইজন্য যদিচ এখনকার কবিদের কাব্য কাব্যই নয়—তবু তাব পাঠক জোটে—তবু তা ভালো লাগবার লোকের অভাব হয় না।

বন্ধুটি বলিলেন—যদিচ আত্মার প্রমাণ নেই, তবু আর একটু স্পষ্ট ক'বে বুঝিয়ে বলা কি সম্ভব নয়?

—কেন সম্ভব নয়। আত্মাকে একটা অদৃশ্য বিন্দু বলে' কল্পনা করে নিন—যে বিন্দুব অভিমুখী মানুষের দৈহিক বৃত্তি, বুদ্ধি, আবেগ, কল্পনা সমস্ত কিছুই। অর্থাৎ এই সব থেকে একটি ক'রে রেখা টানা হ'লে সব গিয়ে মেশে যে অদৃশ্য বিন্দুটিতে—তাকেই কল্পনা ক'রে নিন আত্মা ব'লে। এখন মহাকাব্য এই সর্ববৃত্তিব কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত বলেই তা নাড়া দেয় আমাদের অস্তিত্বেব সমস্তটাকে। বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত কাব্য কেবল বুদ্ধিকেই নাড়া দিতে পারে। বুদ্ধি ব্যাপারে যে লোক নিম্নতর স্তরে আছে বুদ্ধির কাব্যে তার কোন প্রকার সমর্থন থাকা সম্ভব নয়। হোমারের কাব্যের আবৃত্তি শুনলে নিতান্ত নিরক্ষর লোকেও বিচলিত হবে; কারণ, ও কাব্য নিরক্ষরের জন্যও, কিম্বা নিরক্ষরেব জন্যই সৃষ্টি। অক্ষর আবিষ্কারের পূর্বে রচিত হ'য়েছিল হোমারের কাব্য।

এমন সময়ে চাকরে চা লইয়া আসিল। বন্ধুটি বলিলেন—কাব্য সৃষ্টিতে এমন পরিবর্তন ঘটবার কারণ কি?

প্র-না-বি বলিলেন—যা অনিবার্য তা'তো ঘটেইছে, সে জন্য বিলাপ ক'রে চা ঠাণ্ডা ক'রে লাভ নেই।

এই বলিয়া তিনি আমাদের পেয়ালায় চা ঢালিয়া দিলেন—আর নিজে অন্য কি একটা পদার্থ ঢালিয়া লইলেন ?

আমি শুধাইলাম—ওটা কি ?

প্র-না-বি হাসিয়া বলিলেন—গরম জলে তুলসীপাতা সিদ্ধ।

—এ আবার কি রকম খেয়াল ?

তিনি বলিলেন—আর দশজনে যা করে তা করা আমার স্বভাব নয়।

আমি বলিলাম—যেমন আপনার এই কল্‌কাতা ছেড়ে জনহীন মাঠের মধ্যে প'ড়ে থাকা ?

তিনি হাসিয়া বলিলেন—নিতান্ত মিথ্যা বলেন নি।

চা পান শেষ হইলে তিনজনে তাঁহার বাগানের মধ্যে বাহিব হইয়া পড়িলাম।

প্র-না-বি বলিতে লাগিলেন—এখানে কেন থাকি জানেন ? এখানে থাকলে মনে হয় পৃথিবীর একেবারে বুকের কাছে এসে পড়েছি। কলকাতায় থাকতে মনে হ'ত প্রকৃতির বুকের উপরেই আছি বটে, তবে দু'জনের মিলনের নিবিড়তার রসভঙ্গ ক'রে মাঝখানে রয়েছে তার বুকের স্বর্ণ অলঙ্কারটি। এখানে প্রকৃতির অলঙ্কার-খসা নিরাবরণ বক্ষ আমাকে ঘনিষ্ঠ ক'রে টেনে নেয়। এখানকার ঝিঁ ঝিঁ ডাকা দুপুরের ঘুঘুর করুণ কাকলী ভীরু প্রকৃতির শঙ্কিত মিনতির মতো ; এখানকার তরুণতাকে স্পর্শ করলে বিশ্বের রক্ত প্রবাহের বেগ যেন অনুভব করতে পারি ; আর মাঠের মাঝে ঘাসের উপরে শুয়ে পড়ে শুনতে পাই পৃথিবীর হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে আমার হৃৎস্পন্দনের ঐক্যতানে দোহার চলছে ; ব্রজলীলার যাত্রায় একদিন দেখেছিলাম, যুবতী রাইমাধুরীর খঞ্জনীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজছে কিশোর একটি বালকের ছোট্ট এক জোড়া

খঞ্জনী, সেই কথা মনে প'ড়ে যায়। এমন একটি মোহময় আবেশ ঘন হ'য়ে আসে যে মনে হয়, জানকীর মতো প্রকৃতির দ্বিধা বিভক্ত বক্ষের মধ্যে আমি তলিয়ে চলে গেছি, অযোধ্যার ঐশ্বর্য, পতির প্রেম, সতীর সুনাম যার তুলনায় সর্বৈব মিথ্যা! আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে প্রকৃতির খেলা ঘরে।

তারপরে তিনি আমেরিকান বন্ধুটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আপনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষের এই বাণী নিয়ে যান। পশ্চিমের ট্রাজেডি এই যে, সে প্রকৃতির থেকে অত্যন্ত দূরে গিয়ে পড়েছে; তাই তার শান্তি নেই। ভারতবর্ষ এখনও প্রকৃতির কোলের কাছ ঘেঁসে রয়েছে—দয়া ক'রে তাকে আর দূরে যেতে লুব্ধ করবেন না। পশ্চিমের দেশ যদি আবার প্রকৃতির কোলের কাছে আসতে পারে—তবেই সে আত্মার স্তরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনি তার শিল্পে এবং ধর্মে পুনরুজ্জীবন ঘটবে—তার পূর্বে নয়।

প্র-না-বি-র নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্টেশনের দিকে আমরা রওনা হইলাম। বন্ধুটিকে শুধাইলাম প্র-না-বি'কে দেখিয়া কি মনে হইল?

তিনি বলিলেন—লোকটা কবি, পাগল না বিদূষক—ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

আমি মনে মনে বলিলাম—বোধ করি এক সঙ্গে তিনটাই।

ইংলণ্ডকে স্বাধীনতা দানের চেষ্টা

এবারে আমার সঙ্গী একজন ইংরেজ। আমরা প্র-না-বি'র বাড়িতে গিয়া দেখি তিনি একমনে কি লিখিতে ব্যস্ত। আমাদের দেখিয়া হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইস্, লোকটা কি লম্বা—আর সেই অনুপাতে চওড়া। যেন এ-যুগের বাঙালী নয়—রামায়ণ মহাভারতের আমলের কোন বীর। মুখে পাতিয়ালার মহারাজার মতো ঘন চাপ দাড়ি।

আমি বলিলাম—কিছু জরুরী লিখ্‌ছিলেন বুঝি?

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ, জরুরী বৈ কি। ইংরেজ তো সাহস ক'রে আমাদের স্বাধীন শাসন দিতে পারলো না, তাই আমি ওদের জন্য একটা নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করছিলাম। আমরা ওদের স্বাধীনতা দেবো।

এ আবার কি কথা? ইংলণ্ড কি স্বাধীন নয়?

আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন—না, ইংলণ্ড এখনো স্বাধীন হয় নি।

আমি বলিলাম, ইংলণ্ড কার অধীন?

প্র-না-বি বলিলেন, কোন জাত বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের নয়, ইংলণ্ড যন্ত্রের অধীন। আর সত্যি কথা বলতে কি, ইউরোপ আর আমেরিকা দুই-ই এখনো যন্ত্রের অধীনতা ভোগ করছে।

তারপরে হাসিয়া বলিলেন—কিছুদিন আগে নিউইয়র্কে 'লিফ্‌ট-ম্যানেরা' ধর্মঘট করছিল মনে আছে? এ দুর্ভোগ কেন? যেখানে দশ হাজার লোক ইচ্ছে করলে দশ লক্ষ লোককে অচল করে দিতে পারে, তার মূলে রয়েছে যন্ত্রের শাসন।

ইংরেজটি বলিলেন—কিন্তু বিশ পঁচিশ তালা বাড়িতে 'লিফ্‌টে' না থাকলে চলে কি ক'রে?

প্র-না-বি বলিলেন—বাড়িগুলোকে অত উঁচু ক'রে গড়বার প্রয়োজনটা কি?

ইংরেজ বন্ধুটি—তা না হইলে শহরের আয়তন যে আরো বেড়ে যাবে।

প্র-না-বি বলিলেন—বড় বড় শহর গড়ে তোলবার আমি পক্ষপাতী নই। যে যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, সেই যান্ত্রিকতার ফলেই অতিকায়িক শহরের উৎপত্তি। একেবারে যন্ত্রের মূলে আঘাত করতে পারলে শহরগুলো আপনা থেকেই ক্ষুদ্রায়ত হয়ে আসবে—তখন 'লিফ্‌ট-এর' সঙ্গে 'লিফ্‌ট-ম্যান' অনাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। বহুকাল আগে তথাগত একবার হিন্দুসমাজের ধর্মগত অতি জটিল কর্মকাণ্ডের মূলে আঘাত করেছিলেন—বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীর আঘাত তেমনি বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের মূলে। আমি মহাত্মা গান্ধীর চেলা।

সাহেবটি এতক্ষণ আক্রমণের সুযোগের আশায় ছিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি মিঃ গান্ধীর চেলা, কিন্তু শিকার করেন কেন? ওটা কি হিংসা নয়?

প্র-না-বি গম্ভীরভাবে বলিলেন—আমি হিংস্র পশুকে গুলী মারি—কিন্তু সে গুলী বারুদের নয়, আফিমের গুলী। ভালুক যখন হাঁ ক'রে ছুটে আসে, আমি অব্যর্থ লক্ষ্যে বন্দুক থেকে আফিমের গুলী তার পেটে ঢুকিয়ে দিই। তার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণীটা নেশাগ্রস্ত হয়ে ঢুলে পড়ে যায়। তখন তাকে ধরে নিয়ে এসে একটা খাঁচায় পুরে রাখি।

দুইজনে যুগপৎ বলিলাম—কেন?

—তাকে অহিংস করে তুলবার জন্যে। একটু থামিয়া পুনরায় শুরু

করিলেন—পশু হিংস্র কেন? তারা নিয়মিত খাদ্য পায় না বলেই তাদের স্বভাব হিংস্র হয়ে উঠেছে। আমার 'থিওরি' হচ্ছে কোন পশুকে যদি নিয়মিত খাদ্য দেওয়া যায়, তবে তার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটবেই। এক পুরুষে হবে না, কিন্তু কয়েক পুরুষের মধ্যেই তাদের স্বভাব বদলিয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস, পশুকে এভাবে শিক্ষা দিতে থাকলে মানুষের আগেই তারা অহিংস হ'য়ে উঠবে। দেখেন নি যে বাড়ির বিড়াল নিয়মিত যথেষ্ট খাদ্য পায়, তারা আর হিংস্র থাকে না—অথচ পশুতত্ত্বের বিচারে বিড়াল আর বাঘ এক জাতের প্রাণী।

আমি শুধাইলাম, কিন্তু মানুষ কি আপনার এই পন্থা গ্রহণ করবে?

তিনি বলিলেন—মহাত্মাজীর পন্থাই কি মানুষে গ্রহণ করেছে? কিন্তু নিশ্চয় জানবেন তাঁর পথে একদিন সকলকে এসে দাঁড়াতে হবেই। তখন সবাই আমার পন্থাটাকেও গ্রহণ করবে। আমি তো মহাত্মাজীর সামান্য শিষ্য ছাড়া আর কিছু নই।

ইংরেজটি বলিলেন—তখন কি সবাই আফিমের গুলী দিয়ে পশু শিকার করবে?

প্র-না-বি বলিলেন—না, তখন আর আফিম দিয়ে পশুকে নেশাগ্রস্ত করবার প্রয়োজন থাকবে না। কারণ মানুষে ব্যাপকভাবে অহিংস হয়ে উঠবার অনেক আগেই পশু জগৎ অহিংস হয়ে উঠবে। একথা আগেই বলেছি। পশুর হিংসা অভাবে, মানুষের হিংসা স্বভাবে। অভাব যায়, কিন্তু স্বভাব মরলেও যেতে চায় না।

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা হ'লে তখন আপনার মতো শিকারীদের কি অবস্থা হবে?

তিনি অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বলিলেন—কেন, তখন তারা ঘুড়ি শিকার করবে। আকাশে উড়িয়ে দেবে হাজার হাজার ঘুড়ি, আর শিকারীরা

বন্দুকের গুলী দিয়ে তা মাটিতে পেড়ে ফেলে যে আনন্দ পাবে, তা শিকারের আনন্দের চেয়ে কম নয়। আর এই ঘুড়ি উড়াবার ব্যবস্থা করে দেবে তখন আদর্শ অহিংস রাষ্ট্র। আপনাদের দেশে—

এই বলিয়া তিনি সাহেবটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

আরো একটা নূতন অহিংস আমোদ দেখা দেবে। ঝড়ের দিনে মাঠের মাঝে মাথার টুপি উড়ে গেলে, লোকে তার পিছু পিছু ছুটবে—এখন যেমন ইংলণ্ডের বীর পুরুষেরা ছোটে আর্ত খেঁকশিয়ালটার পিছনে।

তারপরে হাসিয়া বলিলেন—স্থূলকায় 'জনবুল' অপরের ধাবমান টুপির পিছনে ছুটে চলছে ভাবতেও শরীর পুলকিত হয়। আর যাই হোক, পরের স্ত্রীর পিছনে ছোটার চেয়ে পরের টুপির পিছনে দৌড়ানো সামাজিক স্বাস্থ্যের বিচারে অনেক বেশি কাম্য। নয় কি ?

সাহেবটি শুধাইলেন—আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে, গান্ধীবাদ কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে ?

—নিশ্চয়ই।

—কতদিন পরে ?

প্র-না-বি—সময়টা নিয়ে যা কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু আণবিক বোমা আবিষ্কারের পরেই সে সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে।

বিস্মিত ইংরাজ বন্ধুটি বলিলেন—কেমন ক'রে ?

প্র-না-বি—গান্ধীবাদ হচ্ছে অহিংসার চরম, আর আণবিক বোমা হিংসার চরম। এবারে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সমান হওয়াতে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, চাকা ঘোরবার সময় উপস্থিত। বুদ্ধদেব করেছিলেন ধর্মচক্র প্রবর্তন, গান্ধীর হচ্ছে কর্মচক্রের প্রবর্তন। যাকে আমরা যান্ত্রিকতা বা **Industrialism** বলি, এ হচ্ছে গিয়ে একটা অতি জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার

একটা অবস্থা বিশেষ। তা যদি হয়, তবে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, এর পরেও একটা অবস্থা আছে। সেটা কি? Industrialism-এর পরের অবস্থা Post-Industrialism বা যন্ত্রোত্তরবাদ ছাড়া আর কি হতে পারে? গান্ধীবাদ বলতে বোঝায় সমগ্র জীবনের একটা পরিপূর্ণ তত্ত্ব। তাকে বিশ্লেষণ করলে পাই—সত্য, সেইটেই মানব জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার একমাত্র উপায় অহিংসা। আর অহিংসার অনুকূল পরিবেশ হচ্ছে গিয়ে যন্ত্রোত্তরবাদ। তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই রকম—যন্ত্রোত্তরবাদ, অহিংসা, সত্য।

ইংরাজ বন্ধুটি ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—আমার তো মনে হয় না যে, অহিংসা কোনকালে ব্যাপক সফলতা লাভ করবে?

প্র-না-বি—হিংসাই কি ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে? যুদ্ধ কেন, না শান্তির জন্য। কিন্তু শান্তি কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তা যদি না হ'য়ে থাকে, তবে বলতে হবে যে হিংসার সার্থকতার বিরুদ্ধে মানুষের ইতিহাসের সাক্ষ্য। তা ছাড়া, অহিংসার পরীক্ষার জন্যে কত বছর সময় মানুষে দিয়েছে?—কুড়ি বছর। কিন্তু হিংসার পরীক্ষা আর মানুষের ইতিহাসের দীর্ঘতা সমান। কাজেই অহিংসার ব্যাপক সফলতা যে অসম্ভব একথা বলবার সময় এখনো নিশ্চয় আসেনি।

ইংরাজ বন্ধুটি এই অনতিসমাপ্য প্রসঙ্গকে চাপা দিবার জন্য বলিলেন—সেদিন আপনি আমেরিকার উদ্দেশে একটি বাণী দিয়েছেন—আজ আমি ইংলণ্ডের জন্য বাণী প্রার্থনা করছি আপনার কাছে।

প্র-না-বি বলিলেন—সেই বাণীই তো আমি রচনা করছিলাম—আপনাদের আসবার আগে। ইংলণ্ডকে স্বাধীনতা দেবার উদ্দেশ্যে নূতন শাসনতন্ত্র। শীঘ্রই এই শাসনতন্ত্র জগতের সমক্ষে প্রকাশ ক'রে

ঘোষণা করবো যে—ইংলণ্ড আত্মশাসনে এমন অপটু যে অন্য দেশ শাসন করবার রাজনৈতিক অধিকার বিন্দুমাত্র তার নেই।

ইহা শুনিয়া ইংরাজ বন্ধুটির মুখ রসুনের মতো ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তিনি কুণ্ঠিতভাবে শুধাইলেন—এই বিপদ থেকে বাঁচাবার উপায় কি নেই?

প্র-না-বি—আছে বই কি! যত সত্বর সম্ভব ভারতবর্ষের সঙ্গে বন্ধন ছেদন। তখন আর আপনাদের ঘরোয়া বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশের আমাদের কোন অধিকার থাকবে না।

বন্ধুবরের মুখের রসুনের পাণ্ডুতা আশ্বস্ত হইয়া পলাণ্ডুর রক্তিমায় পরিণত হইল। তিনি বলিলেন—আপনি আর কিছু দিন আপনার শাসনতন্ত্রের খসড়া চেপে রেখে দিন। আমি দেশে ফিরে গিয়ে এই আসন্ন বিপদের কথা যাতে সকলকে জানাতে সুযোগ পাই, সেই সুযোগটুকু আমাকে দান করুন।

প্র-না-বি হাসিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

এমন সময়ে ভৃত্য চা ও খাবার লইয়া প্রবেশ করিল। তার পরে চা পানের পালা। সে সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই, এমন কি প্র-না-বি'র চা পান সম্বন্ধেও নাই।

মাত্রাজ্ঞান

আবার আসিয়াছি প্র-না-বি'র সাক্ষাতে। এবারে আমার সঙ্গী একজন চীনদেশীয় ভদ্রলোক। প্র-না-বি উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার ভৃত্য আমাকে চিনিত, সে আমাদের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। শুনিলাম বাবু শিকারে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই। ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করার চেয়ে বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ানো শ্রেয়ঃ মনে করিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্রাচীরের পাশে সারি সারি ফুলের গাছ—জবা, করবী, ঝুমকোলতা—আর আছে কতকগুলি বিদেশী গোত্রের ফুল, এদেশের মাটিতে রস পাইয়াছে, কিন্তু এদেশের ভাষায় এখনো নামটি পায় নাই; এ যেন বাড়ির নবজাত শিশুটি বিশিষ্ট নামের অভাবে যাহাকে 'খোকা' বলিয়া সবাই ডাকে। আর আছে সারিবদ্ধ গাঁদা ফুলের গাছ—সুডোল স্বর্ণ-গাঁদার কুঞ্জ অচঞ্চল মহিমায় স্থির হইয়া আছে।

আমি চীন দেশীয় বন্ধুটিকে বলিলাম যে—বাগানে ফুল প্রচুর, কিন্তু বসন্তের ফুলের শোভার কাছে এ কিছুই নয়।

চীনা-বন্ধু হাসিয়া বলিলেন—আমাদের দেশের কবিদের কিন্তু ভিন্ন মত। তাঁহারা বলেন, বসন্তকালে ফুল সংখ্যায় বেশি, কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য শীতকালে যেমন প্রকট হয়—এমন আর কোন সময়ে নহে। জনতার মানুষে আর একটি বিশিষ্ট মানুষে যে প্রভেদ, অনেকটা তেমনি। ভীড়ের মধ্যে মানুষ নির্বিশেষ—সে কেবল মানুষ মাত্র—ব্যক্তি নয়। বসন্তের ফুলের হাটে বড় বেশি ঠেলাঠেলি, গাদাগাদি—আর আপনি তো জানেন, সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রাচুর্যের চিরবিরোধ। ফুলের সৌন্দর্য

কবির চোখে দেখিবার আসল সময় শীতকাল। অনন্ত আকাশ, অবাধ পৃথিবী, অগাধ রৌদ্র—তার মধ্যে একটি মাত্র গাঁদা ফুল—এর কি তুলনা আছে ?

আমি শুধাইলাম—সৌন্দর্যে আর প্রাচুর্যে বিরোধ কি সত্যি ?

—সত্যি নয় ? অলঙ্কারের দোকানে আছে অজস্র মুক্তা, সেখানে প্রাচুর্য। কিন্তু সুন্দরীর কানে আছে একটিমাত্র মুক্তার দুল—সৌন্দর্য সেখানে। সোনার খনিতে প্রাচুর্য—সৌন্দর্য একটি মাত্র সোনার বলয়ে। রাণীর সহস্র সখী, তাদেব সৌন্দর্য নাই—কিংবা থাকিলেও সহস্রের অন্তরালে তা প্রচ্ছন্ন, আব রাজ্ঞী একাকিনী সিংহাসনে আসীন বলিয়াই তিনি সুন্দর।

আমি শুধাইলাম—এমন কেন হয় ?

চৈনিক বন্ধু বলিলেন—সৌন্দর্যের রহস্য মাত্রাজ্ঞান। মাত্রাচ্যুত হইলেই সৌন্দর্য প্রাচুর্যে পরিণত হয়। ভোজন-বিলাসীর কাছে আহার্য সুন্দর, পেটুকের দৃষ্টি শুধু তার প্রাচুর্যের দিকে। সৌন্দর্যে যা মাত্রাজ্ঞান, ভাষায় তাকেই বলি ছন্দ, আবার জীবনে তাবই নাম সংযম। তালের কঠিন বন্ধনে বদ্ধ না হইলে নৃত্য বলুন, সঙ্গীত বলুন—কিছুই সার্থক হইত না। বিধাতাপুরুষ জীবন-মৃত্যুর অমোঘ গ্রন্থিতে সংসারকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই সংসার চলিতেছে।

এমন সময়ে আমাদের পিছন হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—ঠিক এইজন্যই পুরুরবার গৃহত্যাগ করিয়া উর্বশী পালাইতে বাধ্য হইয়াছিল। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে গৃহিনীর পদে অধিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলে মাত্রাচ্যুতি ঘটা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

আমরা চাহিয়া দেখিলাম—প্র-না-বি। তিনি বলিলেন—আমি বড়ই দুঃখিত যে, আপনাদের অপেক্ষা করিতে হইল। এত দেরি হইবে

ভাবি নাই। কিন্তু শিকারের গতি সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া পূর্বাহ্নে কিছু বলা সম্ভব নয়। শিকারীর ভাগ্য চির-অনিশ্চিত। ওর একটা মোহ আছে,—আর মোহ যাতে আছে তার সম্বন্ধে নিয়ম করা চলে না।

আমি চীনা বন্ধুর সঙ্গে প্র-না-বি'র পরিচয় করাইয়া দিলাম। তারপরে তিনজনে তাঁহার সূর্যমুখী বাড়িতে গিয়া বসিলাম।

চীনা বন্ধুটির উপস্থিতিকে সূত্র করিয়া আমাদের কথাবার্তা চীন ও ভারতবর্ষের সভ্যতা সম্বন্ধে আরম্ভ হইল। প্র-না-বি বলিলেন—ওই যে মাত্রাজ্ঞানের কথা বলিতেছিলেন—ওটাই হইতেছে সবচেয়ে বড় কথা। ইউরোপের সভ্যতায় আর সবই আছে, কেবল মাত্রাজ্ঞানের অভাব। সেই জন্যই ইউরোপ বারংবার আদর্শকে লঙ্ঘন কবিয়া গিয়াছে। ওদের সভ্যতার আদর্শ (যদি তাহাকে আদর্শ বলা যায়) প্রাচুর্য ছাডা কিছু নয়। এই প্রাচুর্যের সাধনায় ওবা এমনই উন্মত্ত যে, ধর্মবোধ ওদেব কাছে তুচ্ছ। প্রাচুর্যের সন্ধানে ওরা দেশ-বিদেশে লুঠতরাজ করিয়া ফিরিতেছে। প্রাচুর্যের স্বর্ণ চূডাকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিবার দিকে বেচারাদেব এমনই ঝোঁক যে, অপব দেশেব ধনপ্রাণ ওদেব কাছে নিতান্ত খেলাব বিষয়। আমাব বিশ্বাস, পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ছিল, এখনো আছে চীনে ও ভারতবর্ষে।

চীনা বন্ধুটি হাসিলেন। তিনি বলিলেন—ওবা কি তা স্বীকাব করিবে?

—মাতাল কি স্বীকার কবে যে, সে প্রকৃতিস্থ নয়?—কিংবা অমদ্যপায়ী প্রকৃতিস্থ? তাতে তো সত্য অপ্রমাণ হয় না। আসল কথা কি জানেন, ইউবোপের দস্তুর সভ্যতার মোহ হইতে আত্মবক্ষা করিয়া আমাদের চলিতে হইবে। তা যদি আমবা পারি—তবে এই নেশা-ধরানো অনুকরণ-প্রবণতার দুঃসময়টা কাটিয়া গেলে ওবা নিশ্চয়

বুঝিতে পারিবে—চীন ও ভারতবর্ষের সভ্যতার তুলনা নাই। এশিয়ার বিশাল জনহীন প্রান্তরের মধ্যে যে বিরাট অপ্রমত্ত পুরুষ চিরধ্যানের শান্তিতে বিরাজমান—তাঁর পায়ের কাছে একদিন ওদের আসিয়া বসিতে হইবে। কেবল ইতিমধ্যে আমরা যেন সেই স্থানচ্যুত না হই।

আমি বলিলাম—কিন্তু ইউরোপ তো বলে যে সে তার সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে।

প্র-না-বি বলিলেন—কোন্ সমস্যা? অন্নবস্ত্রের সমস্যার কথা যদি বলেন, তবে সে সমস্যার মীমাংসা তারা কি ভাবে করিয়াছে দেখা দরকার। পৃথিবীর আর দশটা দেশকে অস্ত্র ও যন্ত্র দ্বারা বশীভূত করিয়া তবে তারা সেই সমস্যার মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এমন তো চিরদিন থাকিবে না। যখন সে-সব দেশ স্বাধীন হইয়া আত্মনির্ভর হইবে—তখন ইউরোপের বর্তমান সমাধান কি বাতিল হইয়া যাইবে না? যে সমাধানের মূলে আছে আর দশজনের দুঃসহ দুরবস্থা, তাকে কি সমাধান বলা উচিত? এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পরেকার কথা চিন্তা করুন—যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন, আর চীন আত্মনির্ভরশাল—তখন ইউরোপের মাল কোন্ বাজারে বিক্রীত হইবে? আমরা কি তখনো অন্নবস্ত্রের জন্য ইউরোপের মুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব?—নিশ্চয়ই নয়!—তবে?

আর যদি আত্মিক সমস্যার সমাধানের কথা তোলেন—তবে বলিব, এ দুই সমস্যাই একসূত্রে গ্রথিত। আত্মিক সমস্যার সমাধান হয় নাই বলিয়াই তাহার অন্নবস্ত্রের সমাধানও ঘটিল না। আবার পরঘ্ন অন্নবস্ত্র প্রতি মুহূর্তে ইউরোপের আত্মাকে অধঃপাতের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এখন ভারতবর্ষ ও চীন যদি বিচলিত না হয়—তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের আদর্শকে গ্রহণ করা ছাড়া ওদের গত্যন্তর নাই।

প্র-না-বি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, চীনা বন্ধুটি দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তখন তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আপনার দেশের লোককে ধৈর্য ধারণ করিতে অনুরোধ করিবেন। আমরা শাশ্বত আদর্শের বোধিদ্রুম মূলে ধ্যানে বসিয়াছি—ইউরোপের 'মার' নানা প্রলোভনের মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে—তাহার ছলনায় যেন আমবা প্রতারিত না হই। শেষ পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সভ্যতার মধ্যে যে স্বাভাবিক মাত্রাবোধ আছে—প্রাচুর্যের লোভে তাহার যেন আমরা অমর্যাদা না করি। এই সতর্কবাণী ইষ্টমন্ত্রকে জপ করিয়া দুঃসময়ের এই রাত্রি আমাদের উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

ভাঁড়ু দত্ত

সেদিন পথে ভাঁড়ু দত্তর সঙ্গে দেখা। চেহারা ঠিক তেমনি আছে। পাট-পচা জলের মতো গায়ের রংটি কালো ; মাথার চুল কাশের ফুলের মতো শাদা ; তরমুজের বীচির মতো দাঁতগুলি ; আস্ত একটি কাঁঠালের মতো ঝুলিয়া-পড়া উদর আর চোখে শৃগালের ধূর্ততা। বাঙলা দেশের মানুষ কিনা—বাঙলার সব বৈশিষ্ট্য সবাঙ্গে প্রকট করিয়া মূর্তিমান। মাথায় একটি ঝুড়িতে গোটাকয়েক লাউ, কুমড়োর আভাস। হাতে একটি ভাড।

বলিলাম—কি মণ্ডল কোথায় গিয়েছিলে, বাজাবে নাকি ? সে এক মাত্রা মকরধ্বজী হাসি হাসিল। মকরধ্বজী হাসি কি ? সববিধ দাবীর সার্বজনীন উত্তব আছে সেই হাসিতে। এই হাসি দেখিয়া পাওনাদার ভাবে—এবারে পাট উঠিলেই টাকা পাওয়া যাইবে। দেনদার ভাবে শীঘ্র আর স্বদেব তাড়া আসিবে না। জমিদার ভাবে খাজনা মিলিল। প্রজা ভাবে খাজনা মাপ। কিন্তু কাহাবো আশা সফল হয় না—অথচ সকলেই খুসি হয়। এ হাসি এমনি জিনিস। তেমন কবিয়া হাসিতে জানিলে জীবনের অনেক সমস্যা সরল হইয়া যায়।

আবার শুধাইলাম—কোথায় চললে ?

ভাড়ু বলিল—নায়েবের বাড়ি।

—তাই বলো, সেখানে বুঝি কাজ নিয়েছ ?

সে একটু ভাবিয়া বলিল—হাঁ, এক রকম কাজ বই কি।

আমি বলিলাম—ভাঁড়ু ঠিক তেমনি আছ দেখছি। একটুও বদলাওনি।

ভাঁড়ু ভাঁড়টি হস্তান্তর করিয়া বলিল—সেই তো ছিল ভয়,। আমি বদলাইনি অথচ দেশ গিয়েছে বদলে। কিন্তু এসে দেখলাম কোন ভয় নেই। আমি বদলাইনি, দেশও বদলায়নি—বেশ খাপে খাপে মিলে গিয়েছে।

কিন্তু ঝুড়ির রহস্যটা এখনো পরিষ্কার হইল না—তাই পুনরায় বলিলাম, বলি ঝুড়ির ব্যাপারটা কি?

সে একটু কাশিয়া একটু হাসিয়া একটু নীচু স্বরে বলিল—আজ্ঞে-কর্তা, নায়েবের বাড়ি ভেট নিয়ে যাচ্ছি।

ভাঁড়ু বলে কি! নায়েবকে চেনে না, শোনে না, ভেট লইয়া চলিয়াছে।

সে আমার মনোভাব অনুমান করিতে পারিয়া বলিল—ওই তো বললাম, দেশ একটুও বদলায়নি, কাজেই নায়েবও তেমনি আছে। এতে আর চিন্তার কি আছে?

বলিলাম, তোমার ঝুড়িটা একবার নামাও তো দেখি ভিতরে কি আছে?

ভাঁড়ু ঝুড়ি নামাইল। ভিতরে গোটা দুই লাউ, গোটা দুই কুমড়ো, কিছু বেগুন, উচ্ছে ইত্যাদি।

—ভাঁড়ে?

ভাঁড়ু বলিল—তেল।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—এতে কি নায়েব খুসি হবে?

সে বলিল—বলেন কি? খাওয়ার জিনিস পেলে খুসি হয় না এমন মানুষ কি সম্ভব? মানুষকে সবচেয়ে খুসি করা যায় খাওয়ার জিনিস দিয়ে আর খাইয়ে। টাকা পয়সা যতই দিন, মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। আশার অন্ত নেই—কিন্তু পেটের একটা সীমা আছে।

বলিলাম—সবই তো হ'ল, কিন্তু হঠাৎ নায়েবকে ডালা দেবার প্রয়োজন কি ?

সে দার্শনিকের মতো বলিল—কিছুই না—শুধু অভ্যাস ঠিক রাখা।

তাহার উৎকোচতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে আমার বিস্ময় ক্রমে ভক্তিতে পরিণত হইতেছিল। বলিলাম, এ-সব উচ্চাঙ্গের কথা শিখলে কোথায় ?

—আঁজ্ঞে আমি তো বাঙলা দেশেরই লোক।

উত্তরটি সংক্ষেপ—কিন্তু উহাতেই সব বলা হইয়া গেল।

তারপরে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বলিলাম, ভাঁড়ু, দেশের পরিবর্তন হয়নি একথা কি সত্য ?

সে বলিল—দেশ বলতে যদি শহর আর বাড়িঘর আর রেল মোটর বলেন, তবে পবিবর্তন হয়েছে বইকি। কিন্তু মানুষের মতিগতি ঠিক তেমনি আছে।

—আরো একটু খুলে বলো শুনি।

সে বলিল—মুকুন্দ ঠাকুরের চণ্ডীর পাঁচালি তো পডা আছে। কাজেই দামুন্যা গ্রামের কথা আপনাব অজানা নাই। বারা খাঁর অত্যাচারের কথাও জানেন।

—বাবা খাঁর দাপটে ঠাকুবকে ভিটে মাটি ফেলে দামুন্যা ছেড়ে পালিয়ে বাঁকুড়া যেতে হ'য়েছিল। কিন্তু সকলেব তো আর পালানো সম্ভব হয়নি—তাদেব দুঃখেব আব সীমা ছিল না।

—মুকুন্দ ঠাকুব লিখেছে যে পদ্মের নাল তুলে ক্ষুধিত শিশুকে খেতে দিয়েছিলেন। ঠাকুর ভাগ্যবান তাই তাঁর পদ্মেব নাল মিলেছিল। অধিকাংশকে নদীর জল পান করেই দিন কাটাতে হয়েছে—নদীর ঘোলা জল। নায়েবের সিপাই এসে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, লোকে পালিয়ে বনে গিয়ে বাস করতে লাগলো। তখন দেশে যথেষ্ট বন ছিল—

এখন সবাই কোথায় পালায় কে জানে? এদেশে প্রচুর বন থাকা দরকার।

—বনের পশুদের বর্ণনাটা মনে আছে? সেই ভালুকের কথা? আমিই সেই ভালুক। ঠাকুর আমার কথা মনে করেই ভালুকের বর্ণনা করেছেন। মাঝে মাঝে আমি বাঁকুড়া গিয়ে তাকে সব কথা শুনিয়ে আসতাম। ঠাকুর যখন বললেন যে, দামুন্যার কাহিনী নিয়ে পাঁচালী লিখবেন—আমি পায়ে ধরে পড়লাম ঠাকুর আমার কথা একটু যেন থাকে। যেদিন ভালুকের বর্ণনা পড়ে শোনালেন, হেসে মরি। ঠাকুরও বলেন—ভাঁড়ু, তোমাকে ভালুক বলাতে রাগ করনি তো? আমি বললাম, 'রাগ? আমার চেহারা দেখে ভালুক ছাড়া আর কোনও জানোয়ারের কথা মনে হওয়া কি সম্ভব?

তাবপরে একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল—সমস্ত বাঙলা দেশ আজ দামুন্যায় পরিণত হয়েছে। কালকেতুর তাড়নায় এই প্রকাণ্ড অরণ্যের জীবজন্তু বিব্রত। তখন বাঙলা দেশে একটি মাত্র দামুন্যা ছিল—আজ প্রত্যেক গ্রামই এক একটি দামুন্যা। সেই নড়বড়ে পাতার ছাউনি, সেই বর্ষার রাত্রে জল-পড়া ঘরে রাত্রি জাগরণ, সেই তৈজসহীন আহারের সময়ে আমানি খাবার গর্ত থেকে আমানি পান, আর সেই শীতের দিনে গাত্রাবরণহীন দরিদ্রের "জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।"

অনেকক্ষণ বলিয়া সে হাঁফাইয়া পড়িয়াছিল। একটু থামিয়া বলিল—ঠাকুর, সেদিনে আর এদিনে এত মিল, তাই ভাবলাম নায়েবের স্বভাবও ঠিক তেমনি আছে। তাই চলেছি।

এই বলিয়া একটা বৃহৎ সিংহদ্বারের অভিমুখে সে চলিয়া গেল।

আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল—ভাঁড়ুর কথাই ঠিক। বাঙলা দেশ তেমনি আছে। আমরা যাহা পরিবর্তন বলিয়া দেখিতেছি তাহা মায়া। তখনি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে বাঙলা দেশের যথার্থ ঐতিহাসিক বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। কেবল তাঁহার ইতিহাস ঘটনার অনেক আগে লিখিত হইয়াছে। সেইজন্যই তাহা ইতিহাসের চেয়ে বড়—তাহা কাব্য।